সংযম-শিক্ষা

বা

নিম্নতম সোপান।

৺চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ-প্রণীত।

নবম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত।

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী,

৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২২ সন।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

সংযম-শিক্ষা

বা

নিম্নতম সোপান

প্রথম অধ্যায়।

সংযম।

মনুষ্যের উপর বাহ্যজগৎ বা বাহ্যবস্তুর প্রভাব ও আধিপত্য স্বভাবতঃই বড় প্রবল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ঐ সকল ইন্দ্রিয়ও স্বভাবতঃই অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য বাহ্যবস্তু লইয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-করণে মানুষের আসক্তি দুর্জ্জয় ও

দুর্দ্দমনীয়। ঐ আসক্তির জন্য মানুষ পশ্বাদির ন্যায় বাহ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হয়। তখন তাহার হিত অহিত, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছুতেই দৃষ্টি থাকে না। বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জ্জগৎ দুইটী বিপরীত দিকে অবস্থিত; সুতরাং দৃষ্টি বাহ্যজগতে নিবদ্ধ হইলে, অন্ত-র্জ্জগতে আর যাইতে পারে না—এবং বাহ্যজগতে যত অধিক নিবদ্ধ হয়,—যত অধিক কাল নিবদ্ধ হইয়া থাকে, উহার অন্তর্জ্জগতের দিকে ফিরিবার সামর্থ্য এবং সম্ভাবনা তত কমিয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যত্ব, মহত্ব, ধার্ম্মিকতা, ধর্ম্মপ্রিয়তা, ঈশ্বর-পরায়ণতা—এ সমস্ত অন্তর্জ্জগতের জিনিস; ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য-জগতে এ সমস্ত জিনিস কেবল যে পায় না তাহা নহে, অন্ত-র্জ্জগতে এ সমস্ত পাইবার পথও রুদ্ধ করিয়া দেয়। বহির্জ্জগতের পথ ইন্দ্রিয়াদির বড় মনোহর, সে পথে বিচরণ করিতে উহাদের অসীম আনন্দ ও উল্লাস। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের পথ প্রবেশমুখে বড় বন্ধুর, বড় কষ্টকর। সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল সে পথে যাইতে চাহে না, যাইতে পারে না, মানুষকে যাইতে দেয় না, —সে পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে পথে না যাইলেও নয়। সেই পথই পশুত্ব নষ্ট করিবার পথ, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার পথ, ভগবানের নিকট যাইবার পথ। অতএব ইন্দ্রিয় সকল প্রশ্রয় পাইয়া, যাহাতে সে পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে না পারে তজ্জন্য উহারা স্থূলাকারে গঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই, উহাদিগকে অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিবার পথে বাধা দিতে অসমর্থ করিবার চেষ্টার প্রয়োজন। অর্থাৎ জন্মের

পূর্ব্ব হইতেই ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বাহ্যজগৎ অন্তর্জ্জগতের বিরোধী বটে; কিন্তু বাহ্যজগৎ ছাঁটিয়া ফেলিবার উপায়ও নাই—ছাঁটিয়া ফেলা সুবুদ্ধির কার্য্যও নহে। বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিতেই হইবে, রাখা আবশ্যকও বটে, অন্ততঃ যত দিন স্থূল শরীর থাকিবে। অতএব বাহ্য-জগৎ যাহাতে স্থূল শরীরকে স্থূলতর করিতে না পারে, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করিতে না পারে, মানুষকে কুকথা শুনাইয়া কুপথগামী করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাহ্যবস্তুর জন্যই লোকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ভীষণ রিপুর অধীন হইয়া আপনারাই আপনাদের শত্রুতা করে, সদাই অধীর অস্থির সংক্ষুব্ধ থাকিয়া সদুপদেশ শুনিতে বা সৎকার্য্য করিতে অসমর্থ হয়। শাস্ত্রের সার কথা শুনাইলেও তাহারা উহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তদনুযায়ী আচরণে প্ররোচিত বোধ করে না। সমাজের সৎ কার্য্যে তাহাদের মন যায় না, যাইলেও তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে না—ঈর্ষ্যা, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতির প্রাবল্যে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অতএব মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া, মনুষ্যোচিত প্রণালীতে জীবন যাপন করিতে পারিবার জন্য, সর্ব্বাগ্রে বাহ্যবস্তুর মোহ ও প্রতাপ নষ্ট করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। বাহ্যবস্তু ছাড়িতে পারা যাইবে না। অতএব বাহ্যবস্তুর ব্যবহারে ও সম্পর্কে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ, বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি স্বভাবতঃ এতই

প্রবল যে, মানুষ তাহাতে জড়বৎ আবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই আসক্তিকে সংযত সঙ্কুচিত করিতে হইবে। ঐ আসক্তি সংযত কর, সঙ্কুচিত কর—এইরূপ উপদেশ দিলেই উহাকে সংযত বা সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না। বড় আহ্লাদের বিষয়, আমাদের অনেক মনস্বী ব্যক্তি এখন শাস্ত্রের অনুমোদিত এইরূপ এবং ইহার অপেক্ষাও উচ্চ ও উৎকৃষ্ট উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু, বোধ হয়, সে সকল উপদেশের বিশেষ ফল হইতেছে না। কারণ, তদনুসারে কার্য্য করিতে যে শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই; তাহা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত যে আচরণ ও অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য, তাহাও আমাদের নাই। বাহ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি সংযত বা সঙ্কুচিত করিবার জন্য কতকগুলি কার্য্যের প্রয়োজন। পুনঃ পুনঃ নিয়মিতরূপে সেই কার্য্যগুলি করিতে করিতে তাহাতে অভ্যস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ঐ সকল কার্য্য করিতে মনের যে শক্তির প্রয়োজন, অভ্যাসে অল্পে অল্পে তাহার উন্মেষ হইবেই হইবে। অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি উহার প্রতিষেধক কার্য্যে অভ্যস্ত হইবার ফলে সংযত বা সঙ্কুচিত হইবেই হইবে। এই প্রণালীতে সংযম সাধন করিলে, সংযমী হওয়া অসম্ভব—সংযমী হও বলিয়া সহস্রবার উপদেশ দিলেও অসম্ভব। সংযম যাহাতে প্রকৃত পক্ষে শেখা হয়, সংযম যাহাতে স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য এই পুস্তকের এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া কতকগুলি কার্য্য করিবার পরামর্শ দিলাম।

যেরূপ সংযমের কথা বলিলাম, শাস্ত্রে তদপেক্ষা অনেক

কঠিন ও উচ্চ সংযমের কথা আছে। মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইলে; সেই সকল কঠিনতর এবং উচ্চতর সংযম সাধন করিবার প্রয়োজন। সে সকল সংযমের কথা বলিলাম না। কিন্তু যে সংযমের কথা বলিলাম, তাহা সেই সকল সংযমের ভিত্তি-স্বরূপ। সে সংযম অগ্রে সাধিত না হইলে, অপর সমস্ত সংযম অসাধ্য ও অসম্ভব হয়। তাই গ্রন্থের 'সংযম শিক্ষা বা নিম্নতম সোপান' এই নামকরণ করিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংযমের সূত্রপাত।

সন্তান পিতামাতার অনেক দোষ গুণ পাইয়া থাকে। রুগ্ণ পিতামাতার সন্তান রুগ্ণ হয়। সন্তান অনেক স্থলে পিতামাতার শারীরিক গঠনের এবং হাসি প্রভৃতি কোন কোন শারীরিক ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ লক্ষণের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এক দিন সন্ধ্যাকালে ৺কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত উপাসনা-মন্দিরে গিয়াছিলাম। উপাসনান্তে কয়েকটী লোক বেদীর সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী যুবকের ঘাড় দেখিয়া ভাবিলাম, ইনি বোধ হয় ৺কেশবচন্দ্রের পুত্র। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহাই বটে। পিতা-

পুত্রের এরূপ শারীরিক সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেক সময়ে পিতার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিদিগের শারীরিক গঠনাদির বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সহিতও সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাতৃকুল সম্বন্ধেও এইরূপ হয়। কথাই আছে—নরাণাং মাতুলক্রমঃ। এক একটা বংশে সময়ে সময়ে শারীরিক লক্ষণের পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। দীর্ঘাকৃতিদিগের বংশ হইতে কন্যা আনিলে, খর্ব্বাকৃতিদিগের বংশে দীর্ঘাকৃতি দেখা দেয় এবং তদ্বিপরীতও ঘটিয়া থাকে। শরীরের লক্ষণ যে শরীরবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া শরীরান্তরে চালিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ফরাসী রাজা ত্রয়োদশ লুইসের বিখ্যাত সেনাপতি কন্দে অতিশয় খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। একদিন একটা ভোজে খুব রঙ্গ-রহস্য চলিতেছিল। এক ব্যক্তি কন্দের খর্ব্বতার কথা তুলিলেন। রঙ্গ বাড়াইবার জন্য কন্দে আপনিই বলিলেন—আমার পিতা আমার পিতামহ অপেক্ষা খর্ব্ব ছিলেন, আমি আমার পিতার অপেক্ষা খর্ব্ব, ক্রমে আমাদের বংশে খর্ব্বতা বাড়িয়া বাড়িয়া ০ (শূন্য) দেখা দিবে। ইহা শুধু রঙ্গরস নহে, শরীর-রহস্যও বটে। ঘোটক ও ঘোটকীর মিলনে যে জন্তুর জন্ম হয়, তাহা ঘোটক অথবা ঘোটকী। কিন্তু ঘোটক এবং গর্দ্দভীর মিলনে যে জন্তুর উৎপত্তি হয় তাহা ঘোটকও নয়, গর্দ্দভও নয়, ঘোটক এবং গর্দ্দভ উভয়েরই লক্ষণাক্রান্ত। ইউরোপীয় পুরুষ ও ইউরোপীয় স্ত্রীর মিলনে ইউরোপীয়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইউরোপীয় পুরুষ

বা স্ত্রীর সহিত এসিয়াবাসী স্ত্রী বা পুরুষের মিলনে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা ইউরোপীয়ও নয়, এসিয়াবাসীও নয়—উভয়ের মিশ্রণ বা উভয়ের শারীরিক লক্ষণাক্রান্ত। শারীরিক লক্ষণ সন্তানে সঞ্চারিত হওয়া এতই স্বাভাবিক ও সুনিশ্চিত যে, গো অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর শারীরিক দুর্ব্বলতা, খর্ব্বতা, বা অন্য দোষ ঘটিলে, উৎকৃষ্ট গো অশ্ব প্রভৃতির সহিত মিলন ঘটাইয়া, উহাদের উন্নতি সাধন করা হইয়া থাকে। এরূপ কৌশলে উদ্ভিদ্‌রাজ্যেও আকার আয়তন বর্ণ প্রভৃতির যে কত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সাধন করা হইতেছে, তাহা দেখিলে বা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।

কিন্তু মিলনের পূর্ব্বফলে পুরুষের কেবল মাত্র শারীরিক লক্ষণ পরবর্ত্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয় এমন নহে, মানসিক লক্ষণও সঞ্চারিত হয়। অমুক বংশ দানশীল, অমুক বংশ কৃপণ, অমুক বংশ ক্রিয়াবান্, অমুক বংশ পরস্বাপহারী, অমুক বংশ পরোপকারী, অমুক বংশ অপব্যয়ী, অমুক বংশ নাস্তিক—সকলেরই এরূপ জানা আছে। অনেক বংশে এক একটা গুণ বা এক একটা দোষ পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া, এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এক একটা শিল্প-কর্ম্মের এক এক প্রকার প্রবৃত্তির এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। দেখা যায় যে, যে বংশে কোন শিল্পকর্ম্ম পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত হয়, সে শিল্প সে বংশে যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করে, অন্যত্র তেমন করে না। ইহার অন্যথা যে কখনই

হয় না, এমন নহে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম। ভারতের হস্ত-সম্পাদিত শিল্পকার্য্য যে জগতে অতুলনীয় হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ বলিয়া সুযোগ্য শিল্পপ্রিয় শিল্পরহস্যজ্ঞেরাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বোধ হয় যে, এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা উচ্চতম জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে নিম্নতম শিল্পকর্ম্ম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য এক একটি জাতি বা শ্রেণীতে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে ঐ সকল কার্য্য যে বহুস্থলে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, কর্ম্ম বা বৃত্তি বংশগত হওয়ায় অনেক স্থলে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কিন্তু ঐরূপ হওয়ায় উহার যে অপূর্ব্ব উৎকর্ষ হইয়াছে, ইহা বোধ হয় সকলেরই স্বীকার্য্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ দোষ ও গুণ পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের দোষ গুণ বা শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ, পরবর্ত্তী পুরুষে প্রাপ্ত হয়।

অতএব পূর্ব্বপুরুষ সংযমী হইলে, পরবর্ত্তী পুরুষও সংযমী হয়, অন্ততঃ পরবর্ত্তী পুরুষের সংযমী হইবার সম্ভাবনার বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বপুরুষ অসংযমী হইলে পরবর্ত্তী পুরুষ যে কিছুতেই সংযমী হইতে পারে না, এমন নহে। পিতৃপিতামহাদি অধার্ম্মিক হইলে পুত্রপৌত্রাদিকে যে অধার্ম্মিক হইতেই হয়, এরূপ নহে। চরিত্রগঠন সম্বন্ধে পূর্ব্বপুরুষ এবং পরবর্ত্তী পুরুষ সকলেই যে একমাত্র কারণ বা একমাত্র কারণপুঞ্জের বশীভূত

হয়, তাহা নহে*। সুতরাং ধার্ম্মিকের বংশে জন্মিয়াও লোকে অধার্ম্মিক হইতে পারে এবং অধার্ম্মিকের বংশে জন্মিয়াও লোকে ধার্ম্মিক হইতে পারে। নূতন নূতন কারণের বশীভূত হইলে ওরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু চরিত্রগঠন পক্ষে জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণটী যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে, জন্মের পরবর্ত্তী কারণের অন্যরূপ ঘটাইবার শক্তি কমিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। বিশেষ, জন্মের পরবর্ত্তী কারণ কাহার সম্বন্ধে কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা হইতে পারে না; সুতরাং তাহার ফলাফল আয়ত্ত করাও এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ সুনির্দ্দিষ্ট এবং সকলেরই স্বীকার্য্য। অতএব ঐ কারণটীকে ব্যর্থ হইতে দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্যর্থ হইতে দিলে মহাপাতক হইবে। কারণটীর বিষয় অবগত থাকিয়াও যদি আমার সন্তানসন্ততির সংযমী হইবার সুবিধা-করণার্থ আমি স্বয়ং সংযমী না হই, তাহা হইলে, কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটী-বশতঃ আমার ঘোর অধর্ম্ম হইবে। সন্তানসন্ততির ভরণপোষণের ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের প্রাণরক্ষার উপায় না করিলে যেমন নিজের অধর্ম্ম এবং সন্তানসন্ততি ও সমাজের অনিষ্ট হয়, নিজে সংযমী হইয়া, তাহাদের মধ্যে সংযম-প্রবণতা সঞ্চারিত করিয়া, তাহাদিগকে আপন আপন মন সংযম দ্বারা সুকঠিন করিবার উপায় করিয়া না দিলেও ঠিক তেমনই হয়। পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইয়া গিয়াছে। তাহার আর প্রতীকার নাই। কিন্তু এখন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং অটল অধ্যবসায়-সহকারে

আমাদিগকে সংযমশিক্ষা করিতে হইবে এবং আমাদের সন্তানদিগকে সংযম শিখাইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ হইবার ইহাই এখন আমাদের একমাত্র উপায়। অন্য উপায় আছে মনে করিয়া কেবল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিলে, আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ ত হইবেই না, ঘোরতর অনিষ্টই হইবে। এখন আমাদের তাহাই হইতেছে। আমরা মনে করি, ইংরাজ রাজার নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার বাহির করিয়া লইতে পারিলেই আমরা প্রকৃত মানুষ হইব, অথবা জন কয়েক বিধবার বিবাহ দিলেই আমাদের সমাজ সুসংস্কৃত ও সমুন্নত হইবে, অথবা বর্ণভেদ উঠাইয়া দিলেই আমরা অতুলনীয় উন্নতির পথে দৌড়াইতে পারিব ইত্যাদি। কিন্তু এ প্রকারের চেষ্টা অনেক হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কিছুই ত হয় নাই এবং কখনও যে কিছু হইবে, তাহারও ত কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এরূপ চেষ্টায় যে কিছুই হইবার নয়, এমন কথা বলি না ; কিন্তু প্রকৃত মানুষে এরূপ চেষ্টা না করিলে যে ইহাতে কিছুই হয় না, বরং অনিষ্টই ঘটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অস্বীকার করা, প্রায় সমান কথা। আমরা কেবল যে মানুষ নহি, তাহা নহে ; আমরা যথার্থই অমানুষ। আমাদের অন্তর্ভাগ যথার্থই বড় দুর্ব্বল ও কদর্য্য। উহা সবল ও সুন্দর না হইলে, আমাদের কোন চেষ্টাই সফল হইতে পারিবে না, সমস্ত অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইবে। যেখানে যেখানে প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে, কর্ম্মের সফলতা হইয়াছে,

সেখানে সেখানেই নানা দোষের মধ্যেও প্রকৃত মানসিক বল অল্পাধিক মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের মধ্যেই বা কেন তাহার অন্যথা হইবে? আমাদিগকেও মন বলিষ্ঠ এবং অন্তরের মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিতে হইবে। সংযমশিক্ষা তাহার প্রথম ও প্রধান উপায়। কিন্তু সংযমশিক্ষা সহজেও হয় না, শীঘ্রও হয় না। উহা বড় কঠিন সাধনা। উহার জন্য স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় একান্ত আবশ্যক। কিন্তু জন্মের পূর্ব্ব হইতে যে উহাতে দীক্ষিত হয়, তাহার পক্ষে উহা তত কঠিন হয় না; অনেক স্থলে সহজ ও সুখকর হয়। আপনারা সংযম শিক্ষা করিয়া সন্তানসন্ততি বা ভবিষ্যবংশীয়-দিগকে সংযমে দীক্ষিত না করিলে আমাদের আর একমুহূর্ত্তও চলিতেছে না। প্রকৃত মনুষ্যত্বে উপনীত হইবার একমাত্র পথ হইতে আমরা বহুকাল বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:)*(:—

শৈশবে সংযম।

মানুষের স্বভাব-চরিত্র-সূত্র যখন জন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়, তখন শৈশবকাল জ্ঞানের সম্পূর্ণ বা অত্যন্ত অভাবের কাল

হইলেও, তখনও স্বভাবচরিত্র গঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু স্বভাবচরিত্র গঠন পক্ষে জন্মের পূর্ব্বে যেরূপ কারণ উপস্থিত থাকে, জন্মের পর অজ্ঞানাবস্থায় বা জ্ঞানের বহুল অভাবের সময়, সেরূপ কারণ আর উপস্থিত থাকে না; অর্থাৎ শুক্রশোণিতাদির সাহায্যে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃতির ক্রিয়া তখন আর হয় না। তখন অন্যরূপ কারণ উপস্থিত হয়। মানুষের উপর বাহ্য পদার্থাদির ক্রিয়া হইতে থাকে। ঐ সকল পদার্থের ক্রিয়া সম্বন্ধে একটী গূঢ় তথ্য আছে। উহাদের ক্রিয়া মানুষের জ্ঞাতসারেও যেমন হইয়া থাকে; অজ্ঞাতসারেও তেমনই হয়। বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পীড়িত হইলাম, ইহাতে আমার দেহের উপর বৃষ্টির জলের ক্রিয়া আমার জ্ঞাতসারেই হইল। এইরূপ দেহের উপর অনেক বাহ্যপদার্থের ক্রিয়া আমার জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। কিন্তু দেহের উপর বাহ্যপদার্থের ক্রিয়া অজ্ঞাতসারেও হয়। কোন একটী স্থান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইল। ঐ জ্বরের বীজ বাহ্যপদার্থে থাকে। যখন সে স্থানে ছিলাম, তখন ঐ বীজ যে আমার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই—উহা অজ্ঞাতসারে আমার দেহ অধিকার করিয়াছিল। অনেক রোগের বীজই এইরূপে অজ্ঞাতসারে দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু বাহ্যপদার্থের ক্রিয়া কেবলই যে দেহের উপর অজ্ঞাতসারে হয়, তাহা নহে; মনের উপরও হয়। জন্ম হইবামাত্র মানুষ অসংখ্য বাহ্যবস্তুর মধ্যে স্থাপিত হয় এবং তখন হইতেই মানুষের উপর—মানুষের

দেহ এবং মন দুয়েরই উপর—ঐ সকল বস্তুর ক্রিয়া হইতে থাকে। দেহের উপর যে ক্রিয়া হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সদ্যোজাত শিশুর দেহে শীতল বায়ু লাগিলে, তাহার অবিলম্বে পীড়া হয়। কিন্তু বাহ্যবস্তুর সংশ্রব তখন হইতে যে তাহার মন সম্বন্ধেও নিষ্ফল হয় না, তাহাও শীঘ্র বুঝিতে পারা যায়। বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফলে যে শিশুর দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে, সে সুস্থকায় শিশুর ন্যায় প্রফুল্ল হয় না। শিশুর প্রফুল্লতা কতটা তাহার শরীরের ধর্ম্ম, কতটা তাহার মনের ধর্ম্ম, তাহা ঠিক করা কঠিন। বোধ হয়, তাহা দুয়েরই ধর্ম্ম। শরীরকে মন হইতে পৃথক্ করা যায় না। মনকেও শরীর হইতে পৃথক্ করা যায় না। শরীর এবং মন পরস্পরের সহিত অতি গূঢ় সম্বন্ধে সংযুক্ত। তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই, শরীর মন হইতে পৃথক্ ত নয়ই, প্রকৃতপক্ষে মনের দ্বারাই নির্ম্মিত, অর্থাৎ, শরীর মনের ফল মাত্র। সুতরাং বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফল কেবল-মাত্র দেহে বা কেবলমাত্র মনে নিঃশেষিত হয় না। হাত পুড়িয়া গিয়া যখন জ্বালা করিতে থাকে, তখন মনের ক্রিয়াও অল্পাধিক ব্যতিক্রম ঘটে এবং দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় মন অভিভূত হইলে, শরীরও অল্পাধিক অসুস্থ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ নিয়ম জীবনের সকল সময়েই খাটে। শৈশবে খাটে না, এমন হইতে পারে না। সদ্যোজাত শিশুর শরীর আছে, কিন্তু মন নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। মানুষে যাহা যাহা আছে, মানুষ সে সমস্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর কেবল তাহার

উন্নতি অবনতি, হ্রাস বৃদ্ধি, বিকৃতি পরিষ্কৃতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। নবজাত শিশুরও দেহ এবং মন দুইই আছে। তাহার দেহের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার যেরূপ পরিষ্কার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মনের উপর ঐ সকল বস্তুর ক্রিয়ার সেরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, ঐরূপ ক্রিয়া হয় না, এ প্রকার অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। জন্মের পর হইতেই শিশুর মনের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া হইতে থাকে; কিন্তু এত গূঢ়, প্রচ্ছন্ন ও সঙ্কীর্ণ ভাবে হইতে থাকে যে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। অজ্ঞান শিশু যখন কোন বিচার করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ একজনের কোলে কাঁদে, আর এক জনের কোলে শান্তভাবে থাকে, তখন বোধ হয়, তাহার মনের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার নিদর্শনই লক্ষিত হয়। যে তাহাকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া থাকে, তাহাকে স্তন্য পান করায়, দোলা-ইয়া দোলাইয়া গান করিয়া করিয়া ঘুম পাড়ায়, জননী না হই-লেও, সে তাহার কোলে যেমন মনের সুখে থাকে বলিয়া বোধ হয়, অন্যের কোলে তেমন থাকে না। ইহা যেন শিশুর পক্ষ-পাতিতা বলিয়া মনে হয়। এ পক্ষপাতিতা যে অভ্যাস-জনিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। অজ্ঞান শিশু স্নেহের কার্য্যের পৌনঃপুন্যে অভ্যস্ত হয় বলিয়াই, এক এক ব্যক্তির পক্ষপাতী হয়। একবার মাত্র একটু স্নেহ বা সহানুভূতি পাইলে, সে কাহারও পক্ষপাতী হয় না; বহুবার স্নেহ বা সহানুভূতির কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে তবে হয়। কিন্তু অভ্যাসে

একটু মনের প্রয়োজন। কোন কাজ বার বার করা হইলেও তাহা যদি মনে না থাকে, স্পষ্টভাবেই হউক, আর অস্পষ্ট-ভাবেই হউক, তাহার যদি কিছুমাত্র স্মৃতি না থাকে, তবে তৎ-প্রতি আকৃষ্ট বা পক্ষপাতী হইতে পারা যায় না। অজ্ঞান শিশু যে এক ব্যক্তির পক্ষপাতী হয়, তাহার অর্থ এই যে, তাহাতেও মনের ক্রিয়া হয়; যতই দুর্নিরীক্ষ্য হউক তাহাতেও মনের ক্রিয়া হয়, এবং তাহাকেও অভ্যাসের ফলগ্রহণ বা স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞান শিশুর যে মনের ক্রিয়া হয় তাহার আরও অনেক প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া যায়। ছয় মাস, সাত মাস বা আটমাসের শিশুকে লইয়া ভৃত্যেরা অপরাহ্ণে বাটীর বাহিরে পথে পথে বেড়ায় বা মুক্ত স্থানে বসিয়া থাকে। দিন কতক এইরূপ করা হইলে, ঐরূপ শিশুদিগকে ঐ সময়ে বাটীর ভিতর রাখিয়া দেওয়া কঠিন হয়—রাখিয়া দিলে তাহারা কাঁদে অথবা অসুখ বা অসন্তোষের অন্য লক্ষণ প্রদর্শন করে এবং বাটীর বাহিরে গেলেই শান্ত হয় ও বেশ একটু উল্লাস প্রকাশ করে। তখন মাতা বা অপর যে স্ত্রীলোকের কাছে তাহারা থাকিতে ভালবাসে, তিনি মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে কোল পাতিলেও তাঁহার কোলে যায় না। ইহাতে শিশুর মনের ক্রিয়া এবং অভ্যাসের বশবর্ত্তিতা দৃষ্ট হয় বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক নয়।

অজ্ঞান শিশুই যখন মানসিক ক্রিয়ার স্থল এবং অভ্যাসের ফলভোগী, তখন যে শিশুর জ্ঞান অল্পাধিক পরিস্ফুট হইয়াছে,

তাহার মনের অনুরাগ বিরাগ এবং অভ্যাসের বশবর্ত্তিতা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক। সংস্কৃত অভিধানে ষোলবৎসরের অনধিক-বয়স্ক বালককে শিশু বলে। বাঙ্গালা অভিধানে আট বৎসরের অনধিক-বয়স্ককে শিশু বলে। সচরাচর শিশু বলিতে আমরা পাঁচ, ছয়, সাত, আট বৎসরের অধিক-বয়স্ক বুঝি না। কিন্তু ঐ বয়সের মধ্যেই শিশুর যেরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে এবং মনের অনুরাগ বিরাগাদি যেরূপ প্রবল হইতে দেখা যায়, তাহাতে অভ্যাসের ফল অব্যর্থ এবং অনিবার্য্য হইবার কথা। অনেক স্থলে সেইরূপ হইতে দেখা গিয়া থাকেও বটে; সুতরাং সন্তান যাহাতে বড় হইয়া সংযমী হইতে পারে, তজ্জন্য তাহার জন্মের আগে পূর্ব্বপুরুষদিগকে সংযমী হইতে হইবে এবং জন্মের পর পিতামহ প্রভৃতিকে অতি সাবধানে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, সংযমী হইতেই যেন তাহার আনন্দ ও অভিলাষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এখন কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় কেহই এরূপ করেন না। অনেকেই মনে করেন যে, শিশুকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই—তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে আল্গা রাখায় ক্ষতি নাই—সে বালক হইয়া উঠিলে পর, তাহার শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। এরূপ মনে করা বড় ভ্রম। জন্মের পর হইতেই যখন শিশুর দেহ এবং মন দুয়েরই উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন সেই সময় হইতেই তাহার দেহ এবং মন উভয়েরই শিক্ষা ও শাসনের কঠিন ব্যবস্থার প্রয়োজন

বস্তু বড় সহজ জিনিস নয়। উহা আমাদের দেহের সহিতও কথা কয়, মনের সহিতও কথা কয়—জন্মকাল হইতেই কথা কয়। উহারা এতই বলশালী যে, উহাদের কথায় আকৃষ্ট, এমন কি, মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এই জন্য আমাদের ইহকাল ও পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যাহাতে উহাদের অধীন না হইয়া, উহাদিগকে আমাদের অধীনতা স্বীকার করাইতে পারি, তজ্জন্য, উহারা যখন আমাদের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করে, সেই শৈশবকাল হইতে এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য যে, উহারা আমাদিগকে সুকথা ভিন্ন কুকথা শুনাইতে না পারে। পূর্ব্বে আমরা অনেকটা সেইরূপ করিতাম, এখন প্রায়ই তাহার বিপরীত করি। শিশুর শরীর যাহাতে শক্ত হয়, হিম-তাপাদিতে ক্লিষ্ট না হয়, এবং ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং শ্রমক্ষম হইয়া উঠে, পূর্ব্বে এই-রূপে শিশুর পরিচর্য্যা করা হইত। এখন জন্মমুহূর্ত্ত হইতে শিশুকে পশম ফ্ল্যানেল জামা মোজা টুপি প্রভৃতিতে যে ভাবে মুড়িয়া রাখা হয়, তাহাতে বিধাতার বায়ু, বিধাতার বারি, বিধা-তার রৌদ্র, বিধাতার আলোকের সহিত তাহার দেহের সম্বন্ধ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ত থাকেই না, প্রত্যুত এত দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে যে, সৃষ্ট পদার্থের গঠন পক্ষে উহাদের যে প্রভূত কার্য্যকারিতা আছে, তাহা আমাদের দেহের গঠন-সম্বন্ধে একরূপ নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য, যখন কোন কারণে উহাদের সহিত ঐ দেহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়া পড়ে, তখন উহারা ঐ দেহের সহিত

কুকথাই কয়, অর্থাৎ পীড়া প্রভৃতি অনিষ্টোৎপাদন করে। এই রূপ পরিচর্য্যার ফলে এখনকার শিশুর শরীর বড় বেশী মাত্রায় কোমল, সুকুমার বা রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে, এবং বড় হইয়া পুরুষোচিত কঠিনতা লাভ করিতে না পারিয়া, দুর্ব্বল রুগ্ণ অথবা নিস্তেজ হইতেছে। যাহাদের দেহ এইরূপ, তাহাদের মনও এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা সংযম-সাধন করিতে পারে না এখন আমরা এক বেলা না খাইলে এতই অবসন্ন হইয়া পড়ি যে, বিবাহার্থ কন্যা-সম্প্রদান করিবার ভার অন্যের উপর অর্পণ করিতে বাধ্য হই। আমরা ছেলেপুলের যে প্রকার নাম-করণ করিতেছি, অর্থাৎ কাহাকেও রমণীমোহন, কাহাকেও নলিনীকান্ত, কাহাকেও কিরণশশী, কাহাকেও ননীগোপাল, কাহাকেও কামিনীরঞ্জন নাম দিতেছি—তাহাতে মনে হয়, যেন আমাদের শরীরের ন্যায় মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ, আমাদের শরীর এবং মন দুইই বা মেয়েলি রকমের হইতেছে। ইহাতে সংযম সাধন আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তাই জন্মের পূর্ব্ব হইতে এবং জন্মমুহূর্ত্ত হইতে সংযমী হইবার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের শিশুদিগের শরীর যাহাতে শক্ত হয়, তজ্জন্য তাহাদের প্রথম পরিচর্য্যা কতকটা পূর্ব্বের প্রণালী মত হওয়া আবশ্যক। তাহারা একটু বড় হইলে, অর্থাৎ তিন চারি বৎসর অতিক্রম করিলে, আমরা তাহাদের পশম ফ্ল্যানেল প্রভৃতি কমাইয়া দিয়া অথবা একবারে সরাইয়া ফেলিয়া, আর

এক প্রকারে তাহাদের দেহ ও মনের অনিষ্ট করিতে থাকি। পশম ফ্ল্যানেলের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অতিশয় মিহি জামা প্রভৃতি পরাই। তাহাতে তাহাদের শরীর আরও কোমল হইয়া পড়ে এবং পুরুষোচিত কাঠিন্যলাভের আরও অনুপযুক্ত হয়। তাহারা যেন ননীর পুতুল হইয়া উঠিতে থাকে। ও দিকে তাহাদিগকে আমরা নানা প্রকারে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছি। আমরা অন্নকষ্ট স্বীকার করিয়া, এমন কি ঋণ করিয়াও পূর্ব্বের সেই আটপৌরে মোটা কাপড় এবং গড়া এবং পূজা পার্ব্বণের সেই একটু ঢাকাই কাপড় আর চাদরের পরিবর্ত্তে, তাহাদিকে ভাল ভাল জুতা, ভাল ভাল মোজা, সাটিন, মকমল, জরির জামা, পায়জামা, পালকওয়ালা টুপি প্রভৃতি পরাইয়া, এবং পূর্ব্বের সেই নির্দ্দোষ পুষ্টিকর মুড়ি, মুড়কি, রসকরা, খইচুর, চন্দ্রপুলি, ঝুনা নারিকেল, শশা, কলা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে, ঠোঙা ঠোঙা বিষবৎ মিঠাই খাওয়াইয়া তাহাদিগকে এমনই লুব্ধ, মুগ্ধ, অভিভূত করিয়া ফেলিতেছি যে, বড় হইয়া তাহারা এই সকলের মোহ কাটাইতে পারে না। সুতরাং এই সকলের জন্য তাহারা দিশাহারা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। বাহ্যবস্তু দ্বারা আমাদের শিশুদিগকে আমরা অতিশয় কুকথা, প্রকৃত মারাত্মক কথা শুনাইতেছি। তাই বাহ্যবস্তুর জন্য তাহারা পাগল—ইচ্ছামত বাহ্য বস্তু না পাইলে, তাহাদের উৎপাত উপদ্রব, দৌরাত্ম্যের সীমা থাকে না—এ সকলের জন্য এ দেশে আগে কেহ কখনও যাহা করিয়াছিল

বলিয়া শুনা যায় না, কখন কখন আত্মহত্যারূপ সেই মহাপাতক পর্য্যন্ত করিতেছে। কিন্তু সে মহাপাতক প্রকৃত-পক্ষে তাহাদের মহাপাতক নয়, আমাদেরই মহাপাতক। আমরা তাহাদিকে যে কদভ্যাস ও কদাচারের পথে লইয়া গিয়া, লুব্ধ মুগ্ধ অশান্ত এবং অসংযমী করিতেছি, তাহার বিপরীত পথে তাহাদিগকে আনিতেই হইবে। নহিলে, কি ঐহিক, কি পারত্রিক, কোন ইষ্টই আমরা লাভ করিব না, মনুষ্যোচিত কোন কর্ম্মই করিতে পারিব না; ঘোর অসংযমী হইয়াছি বলিয়াই এখন আমরা কেবল আড়ম্বর আস্ফালন করিতেছি, আমাদের সকল কর্ম্মই অজের যুদ্ধ, ঋষির শ্রাদ্ধ, প্রভাতে মেঘাড়ম্বর ও দম্পতির কলহের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইতেছে।

আমাদের শিশুদিগকে যে পথে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না। তাহা আমাদের বড় সুপরিচিত পথ। সে পথ যে পরিমাণে ভারতবাসীর, অন্য কাহারও সে পরিমাণে নয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে, বহুযুগযুগান্তর হইতে তাহা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ-দিগের সেই সরল প্রলোভনশূন্য, বিনাব্যয়ে গম্য, মনুষ্যত্বাভিমুখী পথ—যে পথে গেলে শিশুর শরীর সুস্থ, শক্ত, কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে এবং রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর নিকট মোহকর কথা না শুনিবার ফলে সে আপনাকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবার এবং সংযমশক্তি লইয়া সংসারে

প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হয়, শিশুকে সেই পথে পরিচালিত করিলে অর্থাৎ তাহাকে বাহ্যবস্তুর মোহে মুগ্ধ এবং প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে না দিলে, সে এখনকার ন্যায় রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি দুরন্ত রিপুর ক্রীড়াস্থল হইবে না। সুতরাং সকল বিষয়ে সংযত ও সুমতিসম্পন্ন হইবার ফলে সুপথে অগ্রসর হওয়া; তাহার পক্ষে সহজ ও সুখকর হইবে; আনন্দ ও উৎসাহ সহকারেই সে সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাহাকে সুপথে চালাইয়া দিয়া, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ করাইয়া এবং দুরন্ত রিপু দ্বারা উত্তেজিত করাইয়া দিয়া, আমরা এখন তাহাকে লইয়া যেমন বিপন্ন —ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি, হয় ত তাহাকে যাবজ্জীবন বালাই বিড়ম্বনা মনে করি, তখন আর সেরূপ হইবে না।

এখন ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। কাজ বড় কঠিন, কারণ, আমরা আপনারাই মানসিক ও শারীরিক শক্তিহীন, বাহ্যবস্তুর মোহে অভিভূত, অত্যন্ত অসংযত। সন্তানসন্ততিকে সুশাসিত ও সুসংযত করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। কিন্তু সে কাজ আমাদিগকে করিতেই হইবে। করিবার আবশ্যকতা পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিলে, সে কাজে আমাদের মতি ও প্রবৃত্তি হইবে। তখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি বাড়িতে থাকিবে। বিনিদ্রিত পুরুষকার জাগরিত হইবে, আমরা অপনারাও সংযম শিখিব এবং দৃঢ়সংকল্প হইয়া আমাদের সন্তানসন্ততিকেও সংযত ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিতে সমর্থ হইব। ইহাই এখন

আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ ; বোধ হয় বলিতে পারি, একমাত্র কাজের মতন কাজ। অমরা প্রতিগৃহে, প্রত্যেকে, এই কাজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, আমাদের সমস্ত জাতি বা সমাজের যে একটা নৈতিক শক্তিমত্তা ও সমুত্থান হইবে, তাহার ফলে আমাদের অন্যান্য গুরুতর কার্য্য স্বাভাবিক সহজ ও সুসাধ্য হইয়া পড়িবে। এখন অমরা অনেক কার্য্যই অস্বাভাবিক-ভাবে করিতেছি, সুতরাং করিতে পারিতেছি না। এখন কিছুকাল আমরা নীরবে গৃহের ভিতর গোড়ার কাজ করিলে, তবে গৃহের বাহিরে যাইবার উপযুক্ত ও অধিকারী হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

আহারে সংযমশিক্ষা।

আহারে আসক্তি সকল দেশে সকল লোকেরই আছে। এ আসক্তি ভাল, ইহার অভাব অতিশয় অনিষ্টকর। আহার-ব্যতীত শরীর-রক্ষা হয় না। সুতরাং আহারে অনাসক্তি হইলে, শরীর-নাশের সম্ভাবনা। তদপেক্ষা বিপদ্ আর নাই। কিন্তু আহারে অত্যধিক আসক্তি আর আহার্য্যের লোভ, একই কথা। লোভ মাত্রেই দূষণীয়—নানা অনিষ্টের হেতু, মনুষ্যত্ব-

নাশক। উহা মানুষের উপর বাহ্যবস্তুর আধিপত্য এত প্রবল করিয়া দেয় যে, মানুষ ঐ সকলের নেশায় বিভোর হইয়া পড়ে, ঐ সকলকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া উহাদের জন্য সদাই অধীর, অস্থির, এমন কি, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকে। তাহাতে মানুষ আপনার উপর আপন কর্ত্তৃত্বে, অর্থাৎ আত্মসংযমাদি দ্বারা আত্মশাসনে, সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবলই বাহ্যবস্তুর দ্বারা শাসিত, পরিচালিত ও বিপর্য্যস্ত হয়।

আহার্য্যে আসক্তি বা লোভ ইউরোপে বড় বেশী বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপীয় উপন্যাস গ্রন্থে খানার কথা যত অধিক লিখিত হয়, সংস্কৃত বা বাঙ্গালা গ্রন্থে তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল খানার বিবরণ দীর্ঘই বা কত, পুঙ্খানুপুঙ্খই বা কেমন! তাহাতে রন্ধনশালার বিচিত্র প্রণালীতে রচিত, গোটা পার্টিজ, প্রকাণ্ড পেরু, হাঁকরা শূকর-শাবক, উৎকৃষ্ট অয়েষ্টর প্রভৃতি কত জিনিসই থাকে। লিখিতে লিখিতে লেখক যেন মসগুল—যেন সজল-জিহ্ব। সংস্কৃত সাহিত্যে আহারের কথা আছে, আহারে আনন্দ উল্লাসের কথাও আছে, কিন্তু আহার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিষিদ্ধ; আহার মানুষের নিকৃষ্ট কাজ বলিয়া আহার্য্যের বেশী কথা নাই। ইউরোপে প্রাণটা যেন আহার্য্যে পড়িয়া থাকে। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজের মন পাইতে হইলে, তাহার পেটের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হয়। এক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া, খানা খাইতে যাইবার জন্য এত

জোরে গাড়ী হাঁকাইয়াছিলেন যে, গাড়ীখানা পথভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন—এই কথা লিখিয়া প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স বলিয়াছেন যে, অনেকে খানার নামে এরূপ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। প্রাচীন ভারতে উদর ছিল, উদরের আদরও ছিল; কিন্তু এমন আধিপত্য ছিল না। ভারতের প্রাচীনসাহিত্যে উদর-সেবার কথা বড়ই কম, উদর-সেবার কথায় আসক্তি অনুরাগও যৎসামান্য, উন্মত্ততা ত নাই-ই। বাঙ্গালী প্রাচীন হিন্দু অপেক্ষা মনুষ্যত্বে নিকৃষ্ট, বাহ্যবস্তুতে অধিকতর আসক্ত, বাহ্যবস্তুর মোহে বেশী মুগ্ধ। তাই, বাঙ্গালা সাহিত্যে রন্ধনশালার উপর বড় লোলুপ দৃষ্টি, রন্ধনশালার প্রণালী প্রক্রিয়ার বর্ণনায় যেন কিছু তীব্র আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। মুকুন্দরামের খুল্লনায় রন্ধনের বিবরণ এবং ভারতচন্দ্রের ভবানন্দ-পত্নীর রন্ধনের বিবরণ পড়িলে এইরূপই মনে হয়। শরীর সুস্থ বলিষ্ঠ হইলে, আহারে আসক্তি এবং আনন্দ অথবা উল্লাস হয় বটে। মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র উভয়ের সময়ে বাঙ্গালাদেশ এখনকার অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর এবং বাঙ্গালীজাতি এখনকার অপেক্ষা সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল। সুতরাং কেবল আহার বলিয়া আহারে তখন বাঙ্গালীর আসক্তি ও উল্লাস হইবার কথা—হইতও বটে। কিন্তু মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েরই রন্ধনকথার একটি অতি পরিস্ফুট লক্ষণ এই যে, উহাতে রসনেন্দ্রিয়ের নানারূপে তৃপ্তিপুষ্টির দিকেই ষোল আনা দৃষ্টি। আহার বা আহার্য্যের কথার উপর ওরূপ দৃষ্টি

সংস্কৃত সাহিত্যে একেবারেই নাই। ওরূপ দৃষ্টি মুকুন্দরাম অপেক্ষা ভারতচন্দ্রে তীক্ষ্ণতর। ভারতচন্দ্রের রন্ধনের বিবরণ মুকুন্দরামের বিবরণ অপেক্ষা দীর্ঘ, এবং উহাতে এমন অনেক ব্যঞ্জনাদির ও রন্ধনপ্রণালীর উল্লেখ আছে, যাহা মুকুন্দরামের ফর্দ্দে নাই। মুকুন্দরামের সময়ে বাঙ্গালীর ঘরে মুসলমানীর রান্নার নিদর্শন নাই, ভারতচন্দ্রের সময়ে আছে। ভারতচন্দ্রে "কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা অন্য মাংস সীকভাজা কাবাব" মুকুন্দরামে নাই। স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মুকুন্দরামের সময়াপেক্ষা ভারতচন্দ্রের সময়ে আহার্য্যের সংখ্যা ও সৌখীনতা এবং রসনেন্দ্রিয়ের তুষ্টিতৃপ্তির বাসনা, অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রত্যুত ভারতচন্দ্রের সময়ে রসনেন্দ্রিয়-সম্ভোগের বাসনা অতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

(১)

'বাচার করিলা ঝোল খয়রার্ ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥'

(২)

'বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥'

(৩)

'অম্বল রাঁধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥'

(৪)

'মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥'

মুকুন্দরাম কিন্তু রসনা-সুখের কথা এমন করিয়া, এত করিয়া কহেন নাই। মুকুন্দরামের বাঙ্গালী অপেক্ষা ভারত-চন্দ্রের বাঙ্গালী বাহ্যবস্তুর অধিক অধীন হইয়া উহাদের নিকট অধিকতর কুকথা শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কিন্তু এইরূপ অবনতি সত্বেও তখনকার বাঙ্গালীর সৎকর্ম্মে মতি ছিল। তাঁহারা দরিদ্র জ্ঞাতিকুটুম্বকে প্রতিপালন করিতেন, দুঃখীকে অন্নদান করিতেন, সদাব্রতে সদাই রত থাকিতেন, অতিথিশালায় অতিথিসেবা করিতেন, দেবসেবায় অনুরক্ত ছিলেন, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা করিয়া পথিককে ছায়া দান করিতেন। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান করিতেন। তাঁহারা পরোপকারার্থ আত্মসেবায় বীতস্পৃহ ছিলেন। ধর্ম্মার্থ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। আমরা এ সকলের কিছুই করি না। আমরা আত্মসর্ব্বস্ব—ভোগসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহারা ধর্ম্মশাসন মানিতেন, সুতরাং রসনা-তৃপ্তির অভিলাষী হইয়াও আহারে তাঁহাদের সংযম ছিল। আমাদের ন্যায় তাঁহারা অখাদ্য খাইতেন না; অপেয় পান করিতেন না। আমরা বাল্যকালেও দেখিয়াছি, তাঁহারা প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন না করিয়া, আহার বা জলযোগ করিতেন না; তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও একফোঁটা জলপান করিতেন না। এখনও তাঁহাদের শ্রেণীর বাঙ্গালীর আচার আচরণ তাঁহাদেরই অনুরূপ রহিয়াছে। সেদিন দেখিলাম, এক বৃদ্ধ

আত্মীয় বহুদূর হইতে পদব্রজে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সন্ধ্যার পর আগমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করা হইল। মনে হইল তিনি আমাদের ন্যায় ব্যস্তত্রস্ত হইয়া খাইতে বসিবেন। তিনি কিন্তু হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া কোশাকোশী এবং গঙ্গাজল চাহিলেন। এবং একটি নিভৃত কক্ষে প্রায় একঘণ্টা কাল আহ্নিক করিয়া তবে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। তখনও কিন্তু তাঁহার ব্যস্ততা নাই। আমাদের ধর্ম্মচর্য্যায় মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু করিয়া থাকে। তাই তিনি এবং তাঁহার মত বাঙ্গালী সর্ব্ববিধ অবনতি সত্ত্বেও আহারে এমন সংযত। আমাদের সে ধর্ম্মচর্য্যা নাই, আমরা সে ধর্ম্মশাসন মানি না। আমরা জানি কেবল ভোগ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভোগ। বাহ্য বস্তুই আমাদের দেবতা। তাই আমরা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করি না। অখাদ্যেই আমাদের অধিক আসক্তি—অপরিমিত লোভ। আমরা আহারের সময়াসময়েরও বিচার করি না। আমরা অনেকে বাসিমুখ না ধুইয়া, বাসি কাপড় না ছাড়িয়া, এমন কি শয্যা পর্য্যন্ত ত্যাগ না করিয়া চা বিস্কুট, টোষ্ট রুটী সেবন করি। এইখানে একবৃদ্ধ সাঁওতালের কথা মনে পড়িল। আট বৎসর হইল, আমি দেবগৃহে বাস করিতেছিলাম। একদিন বেলা প্রায় নয় ঘণ্টার সময় এক বৃদ্ধ সাঁওতাল আমার বাসায় কাঠ বেচিতে আসিল। আমি কাঠ লইয়া তাহাকে উহার মূল্য দিলাম। সে তখন কি বলিল। আমি তাহার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমার সহোদর-

প্রতিম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার বাসায় বসিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল হইতে একরকম বৈদ্যনাথবাসী। সাঁওতালাদির কথা কিছু কিছু বুঝেন। তিনি বলিলেন—ওর বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার চায়। তাহাকে রুটী ও গুড় আনাইয়া দিলাম। সে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা খাইয়া ফেলিল না। একটি গাছের একটি সরু ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া ধীরে ধীরে উত্তমরূপে দন্ত ধাবন ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া তবে কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। সংযম ও সদাচারে আমরা সে বৃদ্ধ দরিদ্র অশিক্ষিত সাঁওতাল অপেক্ষাও অধম।

তাহার পর আমাদের আহার্য্যের কত নূতনত্বই হইয়াছে। আহার্য্যের প্রকৃতি কত উচ্চ, কত বিলাসিতাসূচকই হইয়াছে। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র অনেক আহার্য্যের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহার অধিকাংশই অতি সামান্য জিনিস—মাছের তেলে শাক ভাজা, ঘিয়ে ভাজা নালিতা, ফুল বড়ি দিয়া নৈটাশাক, শুক্তানি, ঘণ্ট, দুধ থোড়, ডালনা, চিতল ফলুয়ের ঝাল ঝোল, কই মাগুরের ঝোল, আর কই মাছ ভাজা, আম দিয়া শৌলমাছের ঝোল চড়চড়ী, মাছের ডিমের বড়া, আর কাছিমের ডিম সিদ্ধ, পাঁকাল মাছের অম্ল, হেলঞ্চা শাক দিয়া বোয়াল মাছের চড়চড়ী, কাঁটাল বীচি দিয়া চিঙ্গড়ী, কই কাতলার মুড়ী, তিত দিয়া পচা মাছের গুঁড়া, পরমান্ন, কলার বড়া, মুগসাউলী, বড় জোর ক্ষীর-পুলি, ক্ষীর মোনন্না—সমস্তই গ্রাম্য গৃহস্থের উপযোগী খাদ্য; সংখ্যায় অনেক—কিন্তু অতি সুলভ দ্রব্যজাতে নির্ম্মিত। কিন্তু

এ সকল ছোট ছোট জিনিসে আমাদের তেমন রুচি নাই, আমরা 'পাকপ্রণালীর' লিখিত বহুতর বিচিত্র জিনিস চাই। আমরা মনে করি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র অসভ্য গ্রাম্য লোক ছিলেন, আমরা সভ্য হইয়াছি। তাই তাঁহাদের সামান্য চড়চড়ী, ঘণ্ট, শড়শড়ি খাইতে ও খাওয়াইতে আমরা যেন একটু ঘৃণা, একটু লজ্জা বোধ করি। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের ফর্দ্দের * লিখিত সমস্ত খাদ্যই যে তখনকার লোকে, সাধারণ-ভাবে সর্ব্বদা খাইতেন, এরূপ বোধ হয় না। আহার্য্যের বাহুল্য ও পারিপাট্য, বোধ হয়, ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষেই হইত। আমরা শৈশবে ও বাল্যে এইরূপই দেখিতাম—তাহাও একটু সম্পন্ন ঘরে। অসম্পন্নের ঘরে এইরূপ হইত না, তাঁহারা আপন আপন অবস্থা বুঝিয়া অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ভারতচন্দ্রের কালিয়া দোলমা কাবাবের কথা আমি তখন কানেও শুনি নাই, খাওয়া বা খাওয়াইতে দেখা ত দূরের কথা। কবির আপন সময়েও বোধ হয়, ঐ সকল সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল না, অল্পসংখ্যক ভোগাসক্ত ধনাঢ্যের একরূপ একচেটিয়া ছিল। এখন কিন্তু অসম্পন্নেরাও সামান্য আহার্য্যে সন্তুষ্ট নয়। এমন কি বঙ্গের ও বাঙ্গালীর সেই নিজস্ব লুচি, ভারতচন্দ্রের সেই 'সুধারুচি মুচ-মুচি লুচি'ও আজ আমাদের ঘরে—কি সম্পন্ন, কি অসম্পন্ন—আমাদের অনেকের ঘরে অনাদৃত

* এই অধ্যায়ের শেষে দুইটি ফর্দ্দ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অবজ্ঞাত—এক রকম পদচ্যুত, এবং পোলাও উহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখন দুই চারি খানি মাত্র লুচি 'দীনহীন কাঙ্গালীর' মত, পোলাও পাত্রের এক পাশে পড়িয়া থাকে। আমরা দুঃখী; আহারে এইরূপে লুব্ধ অসংযত হইয়া, আরও দুঃখী হইতেছি এবং মনুষ্যত্ব সঞ্চয়ে উত্তরোত্তর অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের উপর বাহ্যবস্তুর আধিপত্য বড়ই প্রবল হইতেছে *। এই আধিপত্য বিনষ্ট করিতে না পারিলে, কি পার্থিব বিষয়ে, কি পারমার্থিক বিষয়ে, কোন বিষয়েই আমাদের শ্রেয়ঃ নাই,—প্রকৃতপক্ষে সকল দিকেই বিষম বিপদ্ এবং অশেষ দুর্গতি।

আমাদের শাস্ত্রে পঠদ্দশাকে ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ সকল প্রকার পার্থিব ভোগসুখ পরিহারের, বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহের অবস্থা বলে এবং পাঠার্থীকে ব্রহ্মচারী বলে। এখন কিন্তু আমাদের পঠদ্দশাও ব্রহ্মচর্য্য নয়, আমাদের পাঠার্থীও ব্রহ্মচারী নহেন।

---

* পাকরাজেশ্বর নামক গ্রন্থ, 'পাকপ্রণালী' লিখিত হইবার চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। কিন্তু মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী অনধিক ১৪০ বৎসরের মধ্যে ফর্দ্দ যত বাড়িয়াছিল, পাকরাজেশ্বর ও পাকপ্রণালীর মধ্যবর্ত্তী ৪০ কি ৫০ বৎসরের মধ্যে ফর্দ্দ তদপেক্ষা অনেক বেশী বাড়িয়াছে। পোলাও পাকরাজেশ্বরে ১৬ রকম, পাকপ্রণালীতে ৬১ রকম; ডিম পাকরাজেশ্বরে ২ রকম, পাকপ্রণালীতে ৩১ রকম; আচার ও চাটনী পাকরাজেশ্বরে ১০ কি ১২ রকম, পাকপ্রণালীতে ৮১ রকম; পুডিং পাকরাজেশ্বরে নাই, পাকপ্রণালীতে ২২ রকম ইত্যাদি।

বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে, এখনকার কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালিত ছাত্রাবাসে প্রতিদিন রীতিমত ভোজের আয়োজন করিতে হয়। নহিলে ছাত্রগণকে শাস্ত রাখা যায় না; এবং ছাত্রেরা অর্থাৎ কলেজের উচ্চশ্রেণীর যুবকেরা কেহ দুইখণ্ড মৎস্য পাইল, কেহ এক খণ্ড বই পাইল না বলিয়া মহাগোলযোগ করে। বঙ্গের যে টোলে আমড়াভাতে ভাত খাইয়া, ব্রহ্মচারীরা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইতেন, আমাদের ছাত্রাবাস সেই টোলের স্থলাভিষিক্ত এবং আমাদের এই সকল মৎস্যমাংস-লোলুপ মৎস্য-মাংসের জন্য দ্বন্দ্বকারী ছাত্রগণ সেই দিগ্বিজীয় ব্রহ্মচারীদিগের বংশধর; আর যাঁহারা আমাদের বালক ও যুবকদিগকে সুপথে চলিতে উপদেশ ও উৎসাহ দিবেন, তাঁহারা যেন আমাদের এই সকল কুপথগামী ছাত্রগণেরই পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্যার চার্লস ইলিয়ট্ একবার ছাত্রাবাসের প্রতি ছাত্রের আহারের ব্যয় মাসিক দুই টাকা করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে দুই চারি খানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে তাঁহাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল। মাসিক দুই টাকা কিছু কম বটে—কিন্তু দশ পনর টাকাও ত ভাল নয়। পঠদ্দশা হইতেই কঠোরতায় অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। আহারে কষ্টসহিষ্ণু হইলে, পাঠেও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া যায়। বঙ্গের টোলের আমড়াভাতে ভাত এবং পাণ্ডিত্যপ্রিয় জর্ম্মণীর ছাত্রাবাসের অনশনতুল্য আহার প্রণালী, ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার বিপরীত হইলে ফলও বিপরীত হয়। মানুষ একেবারে

আপন অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগ দুই ভাগেরই পরিচর্য্যা করিতে পারে না। পারে, কেবল যদি বহির্ভাগকে অন্তর্ভাগের অধীন ও অনুগামী করে। সেইরূপ করিলে বহির্ভাগের বশবর্ত্তিতা কমিয়া গিয়া, তৎসম্বন্ধে যেন একটু বিরাগ, একটু উদাসীনতা আপনিই জন্মিয়া যায়। তাহার ফলে অন্তর্ভাগ অন্তঃসার সুপুষ্ট হইবার সুবিধা ও অবসর পায়। বঙ্গের টোলে পূর্ব্বে তাহাই হইত, এখনও কিছু কিছু হয়। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার্থীদিগের গৃহ ছাত্রাবাস প্রভৃতিতে তাহার বিপরীত হইতেছে—বহির্ভাগের বশবর্ত্তিতায় অন্তর্ভাগ অসার হইয়া যাইতেছে।

তাই বলিতেছি, আমাদের মধ্যে বাহ্য বস্তুর যে প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা নষ্ট না করিলে, আমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হইবে না। ঐ কার্য্যই এখন আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আমাদের যে সামান্য শক্তিটুকু আছে, অন্য কার্য্যে নষ্ট না করিয়া তাহা এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। নহিলে এই কঠিন কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। প্রতিগৃহস্থকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। ইহা আমাদের মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনরূপ মহাকার্য্য।

বাহ্যবস্তুর অনুবর্ত্তিতা মনুষ্যত্ব লাভের বিরোধী। সুতরাং উহা নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু বাহ্যবস্তু এককালে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। বাহ্যবস্তু রাখিতেই হইবে, কিন্তু উহাদের আধিপত্য নষ্ট করিতে হইবে, মোহ কাটাইতে

হইবে। রসনেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল ইন্দ্রিয়, উহার তৃপ্তি-তুষ্টির জন্য সকলেই লালায়িত, আমরা আজিকার বাঙ্গালী, আমরা ত উহার জন্য বিপন্ন হইয়া পড়িতেছি। আহার্য্যের মোহ কাটাইতে পারিলে, আহারে সংযত হইতে পারিলে, আমাদের উপর বাহ্য বস্তুর আধিপত্য কমিবে। তাহার ফলে আমাদের মনের শক্তি বা অন্তঃসার বর্দ্ধিত হইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইবে। কি করিলে আহারে সংযত হইতে পারা যায়, তৎ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

১। বংশের পরবর্ত্তী পুরুষদিগের যাহাতে আহারে সংযত হইবার প্রবৃত্তি হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বপুরুষদিগকে আহারে সংযত হইতে হইবে। কারণ পূর্ব্বপুরুষের দোষ গুণ পরবর্ত্তী পুরুষে সঞ্চারিত হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। আমরা এখন হইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া আহারে সংযম অভ্যাস করিতে থাকিলে, তবে আমাদের সন্তান-সন্ততি ক্রমে স্বভাবতঃই সংযমপ্রবণ হইয়া উঠিবে। সন্তান-সন্ততিতে স্বাভাবিক সংযমপ্রবণতা থাকিলে, তাহাদিগকে আহারে সংযত করিবার জন্য পিতৃপুরুষের চেষ্টা কিছু সহজে ফলবতী হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, আহারে সংযম অভ্যাস করিতে থাকা গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এ কর্ত্তব্য পালনে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে, আমাদের মহাপাতক হইবে—ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইবে। এখনই কোন্ না অনেকটা হইয়াছে ?

২। পূর্ব্ব অধ্যায়ের লিখিত মত আমাদের শিশুদিগের আহার্য্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এখন অনেক স্থানে বিশেষতঃ সহরাঞ্চলে, শিশুদিগকে আর পূর্ব্বের আহার্য্য—মুড়ি প্রভৃতি দেওয়া হয় না, তৎপরিবর্ত্তে কচুরি, জিলিপি, গজা, নিম্‌কি, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি দেওয়া হয়। এই সকল সামগ্রী এত 'মুখরোচক' যে, তাহাদিগকে পূর্ব্বের নির্দ্দোষ খাদ্য আর খাওয়াইতে পারা যায় না; এই সকল সামগ্রী না পাইলে, তাহারা মহারাগান্বিত হইয়া, নানা উৎপাত উপদ্রব করে। ইহাতে ক্রোধাদি ভয়ঙ্কর রিপু সকল এখন শৈশব হইতেই উদ্দাম হইতে থাকে। দুঃখের বিষয়, সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলেকে ঠোঙা ঠোঙা মিঠাই খাইতে দেখিয়া, অনেক অসম্পন্ন গৃহস্থও আপন আপন শিশুদিগকে ঐরূপ খাওয়াইতে না পারিলে আপনাদিগকে অসুখী ও অপদস্থ মনে করেন এবং ঋণ করিয়াও তাহাদিগকে ঐরূপ খাওয়ান। ইহাতে তাঁহাদের আপনাদের সাংসারিক কষ্টও যেমন বাড়ে, শৈশব হইতে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির আহার্য্যরূপ বাহ্যবস্তুর মোহও তেমনি বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং তখন হইতেই তাহারা আহারে অসংযত হইয়া পড়ে। শৈশবে অসংযত হইলে, পরে সংযত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। তাই বলিতেছি যে, আমাদের শিশুদিগের আহার্য্যের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সহসা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অসম্ভব ও অযৌক্তিক। গৃহকর্ত্তারা সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তন করিবেন।

রসনেন্দ্রিয়ের অযথা উত্তেজনা না হয় এবং আহার্য্যে অপরিমিত লোভ না জন্মে, ইহাই এ বিষয়ে প্রধান কথা বুঝিয়া, পরিবর্ত্তন করিবেন। শিশুর এক্ষণকার আহার্য্যে এই দুই-ই হইতেছে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্কেরাও এই জন্য আহারে এত অসংযত ও বিলাস-পরায়ণ। এই পরিবর্ত্তন উপলক্ষে কেহই যেন এই কথাটি ভুলেন না যে, আহার্য্যের সহিত মান অপমানের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যের অতি গুরুতর সম্পর্ক আছে। একদিন প্রাতে স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া দুইজনে গল্প করিতেছি। তখন তিনি জজ। তাঁহার একটি ছোট মেয়ে আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি খাইয়াছিস্? মেয়ে বলিল—রাত্রের রুটি ছিল, আর আজ সকালে শাক ভাজা হইয়াছিল, তাহাই খাইয়াছি। ধনে মানে পদে পাণ্ডিত্যে পরার্থপরতায় দ্বারকনাথ তখন আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার ছেলেরা শাক ভাজা দিয়া বাসি রুটি খাইত। খাদ্য হইতে মান অপমান যে বহু দূরে, একথাটি যেন ভুলিয়া না যাই।

৩। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-চর্য্যায় নিয়ত নিষ্ঠাবান্ হইলেই মনের উপর বাহ্য জগতের আধিপত্য কমিয়া কমিয়া অবশেষে নষ্ট হইয়া যায়; এবং সাধারণতঃ যাহাকে কষ্টসহিষ্ণুতা বলে, তাহা স্বাভাবিক, সহজ ও সুসাধ্য হইয়া উঠে। কষ্টসহিষ্ণু হইলে, সকল প্রকার সংযম আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। অতএব আমরা আপনারা

যাহাতে শাস্ত্রোল্লিখিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে আসক্ত ও নিষ্ঠাবান্ হই, সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই করিতে হইবে। তাহার পর আমাদের সন্তান-সন্ততি যাহাতে এইরূপ হয়, তাহা করিতে হইবে। এখন আমরাও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিত্যকর্ম্ম করি না, আমাদের সন্তান-সন্ততিও করে না। এজন্য আমাদের কাহারই সংযমাভ্যাসের অবসর ও আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না। সুতরাং, কষ্টসহিষ্ণুতার অভাবে ভোগসুখের সামান্য ব্যাঘাত বা ব্যত্যয় হইলে, আমরাও যেমন, আমাদের সন্তানেরাও তেমনই, বড় বেশী অধীর—অস্থির—কাতর হইয়া পড়ি ও পড়ে। অতএব আমাদেরও দীক্ষিত হইতে হইবে, আমাদের সন্তান-সন্ততিকেও দীক্ষিত করিতে হইবে। দীক্ষিত হইয়া এবং দীক্ষিত করিয়া কিন্তু এ দিকের কাজ শেষ হইল মনে করা হইবে না। এখন অনেকে তাহাই করি ও করেন। নিত্যকর্ম্মের মর্ম্মে প্রবেশ করিলে, পরমানন্দ সহকারে নিত্যকর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারা যাইবে না। তখন বাহ্যবস্তু দূরে পলায়ন করিবে, শরীর এবং মন কোনটীরই সহিত সুকথা ভিন্ন কুকথা কহিতে পারিবে না, এবং সংযম সহজ, স্বাভাবিক ও সুখকর হইয়া, পড়িবে। দীক্ষিত হইয়া এখন অনেকে যে দীক্ষিতের ন্যায় কার্য্য করি না, আহ্নিকাদি ক্রিয়ার অর্থ না বুঝা তাহার অন্যতম কারণ। আমাদের স্ত্রীলোকেরাও সে অর্থ বুঝেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ঐ সকল কার্য্যে পরম নিষ্ঠাবতী; যাঁহারা নিষ্ঠাবতী নহেন, তাঁহারা আমাদের

ন্যায় ভোগাসক্তা বিলাসোন্মত্তা। পুরুষ জ্ঞানপ্রধান এবং স্ত্রীলোক ভক্তিপ্রধানা বলিয়া দীক্ষার পর আমরা প্রায় কেহই দীক্ষিতের ন্যায় কার্য্য করি না, আমাদের অনেক স্ত্রীলোকে করেন। আমাদিগকে নিত্যকর্ম্মে প্রণোদিত করিবার নিমিত্ত ঐ সকল কর্ম্মের একখানি পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা প্রণীত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আচার-প্রবন্ধ'-নামক পুস্তকে ঐ সকল কর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে। উহা সকলেরই আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গ্রন্থের সমস্ত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্বর্গীয় মহাত্মা ঐ ব্যাখ্যাকে পূর্ণত্ব প্রদান করিতে পারেন নাই। অতএব সংযমশিক্ষার্থ এই তৃতীয় অনুষ্ঠান সফল করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে এবং সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিত্যকর্ম্মের একখানি সহজ, সরল, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লিখিত, মুদ্রিত ও বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য ; সুপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণ এই ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনাদি মন্ত্র সংস্কৃতেই উচ্চারিত হইবে, বাঙ্গালায় হইবে না।

৪। রামময় দত্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পুত্র সুধামাধবকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন। পুত্রের বয়স ১৩ বৎসর। পুত্রকে ভোজনের অনুমতি দিয়া, আপনিও ভোজন আরম্ভ করিলেন। পুত্র কিন্তু হাত না ধুইয়াই ভোজন-পাত্রে হাত দিল। পিতা বলিলেন—'ওকি সুধা, তোমাকে কমবার বলিয়াছি, ভোজনে বসিয়া হাত না ধুইয়া অন্নব্যঞ্জন স্পর্শ করিতে নাই, তুমিত

তাহা করিলে না ?' সুধা—'আমার কাছে জলের ঘটী নাই, আর অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, তাই তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিলাম।' পিতা—'না, ভাল কাজ কর নাই ; খাইতে একটু বিলম্ব হইলই বা। অধীর অনাচারী হইও না।'

রামময় সুধামাধবকে এক ঘটী জল আনিয়া দিতে বলিলেন। জল আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। তিনি পুত্রকে বলিলেন—'জল আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া অধীর হইও না। স্থির হইয়া থাক। এইবার জল আসিয়াছে। হাত ধুইয়া খাইতে আরম্ভ কর।'

রামময় সে দিন গৃহিণীকে সুধামাধবের পাতে অগ্রে জলের ঘটী দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

রামময় সর্ব্বাগ্রে পল্‌তার ডালনা দিয়া ভাত খাইতে লাগিলেন। সুধামাধব আঙ্গুলে করিয়া একটু ডালনা মুখে দিয়া, উহা আর খাইল না ; গরম গরম মুচ-মুচে ডালের বড়াগুলি অতি ত্রস্তভাবে টপ্ টপ্ করিয়া খাইতে লাগিল। পিতা বলিলেন—'ও কি করিতেছ ? আগে পল্‌তার ডালনা না খাইয়া, ডালের বড়া কি অন্য কোন ব্যঞ্জন খাইতে নাই, খাওয়া আমাদের রীতি-বিরুদ্ধ।'

সুধা—'বাবা, পল্‌তার ডালনা তিক্ত, ভাল লাগিল না, তাই উহা খাইলাম না। ডালের বড়া খুব ভাল লাগিতেছে।'

পিতা—'তোমাকে কয়েকবার বলিয়াছি, তিক্তরস শরীরের পক্ষে উপকারী ; তথাপি তুমি পল্‌তার ডালনা খাইলে না ; আর

ডালের বড়া মুখরোচক বলিয়া টপ্ টপ্ করিয়া খাইতেছ। তুমি তোমার নিজের ভাল মন্দ বুঝিলে না—তোমাকে একটু দণ্ড দিব। ঐ পল্‌তার ডালনাটুকু খাও, আর যে কয়খানি ডালের বড়া এখনও খাও নাই, তাহা আর খাইতে পাইবে না।

পুত্র ধীরে ধীরে পল্‌তার ডালনা খাইল এবং বড়াগুলি রাখিয়া দিল। পিতা বলিলেন—'মুখরোচক জিনিস খাইবার জন্য উগ্রব্যগ্র হইয়া খাইতে না বসিয়া, উপকারী খাদ্য খাইব বলিয়া ধীর সংযত ভাবে খাইতে বসিও; তিক্ত জিনিসও মিষ্ট লাগিবে।' এই ভাবে পিতার সহিত দিনকতক খাইবার পর পুত্র বলিল—'সত্য বাবা, পল্‌তার ডালনা, শুক্ত প্রভৃতি যথার্থই খাইতে ভাল।

আর এক দিন পুত্রকে লইয়া পিতা খাইতে বসিলেন। সে দিন ডাল, নিরামিষ চড়চড়ি, মাছের ডালনা এবং চিনি দেওয়া ঘন দুধ—ভোজনের এই চারিটি মাত্র উপকরণ ছিল। পুত্র ডাল ও চড়চড়ি দিয়া অতি অল্পমাত্র ভাত খাইয়া, মাছের ডালনা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিতে লাগিল। পিতা বুঝিলেন মাছের ডালনা বালকের বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। তিনি ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'সুধা, মাছের ডালনা আর খাইও না, ঐ ডাল ও চড়্‌চড়ী দিয়া বাকী ভাতগুলি খাও, আমিও মাছের ডালনা আর খাইলাম না।' পুত্রকে তাহাই করিতে হইল। পিতা পুত্রকে বলিলেন—দুধ খানিকটা খাও আর খানিকটা মুখে করিয়া বাহির বাটীতে লইয়া গিয়া

সেখানে ফেলিয়া দিয়া আচমন কর গিয়া।' ভোজন স্থান হইতে বহির্বাটির আচমনের স্থান কম দূর নহে। সুধামাধব সমস্ত পথটুকু সেই সুধাসম ক্ষীর টুকু মুখে করিয়া গেল, বড় ইচ্ছা সত্ত্বেও একটি ফোঁটাও খাইল না বা খাইয়া ফেলিল না।

পিতা কর্তৃক কিছু দিন এইরূপে পরিচালিত হইয়া পুত্র আহারে নির্লোভ ও সংযত হইয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণরূপে রসনাজয়ী হইল। তাহার পর সে কখনও পিতার প্রদর্শিত আহার-পদ্ধতি পরিত্যাগ বা শিথিল করা বিহিত বা নিরাপদ্ মনে করে নাই। পিতা লোকান্তরিত হইলে, সে সেই পদ্ধতি আপনিও অনুসরণ করিত এবং পুত্র-পৌত্রদিগকেও অনুসরণ করাইত।

অতি সাবধানে বিচক্ষণতা-সহকারে এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমাদিগকে এখন ঘরে ঘরে এই প্রণালীটি ধর্ম্মচর্য্যার ন্যায় পালন করিয়া আহারে সংযম শিখিতে ও শিখাইতে হইবে। বাহ্যবস্তুর মধ্যে আহার্য্যের ন্যায় মোহকর ও পরাক্রমশালী বস্তু অল্পই আছে। আহারে সংযত হইতে পারিলে, বাহ্য-জগতের অনেকটা অংশ আমাদের আয়ত্ত এবং আমাদের নিকট পরাস্ত হইয়া পড়িবে। তখন অন্তঃসারের বৃদ্ধিবশতঃ আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রবৃত্তি লাভ করিব।

৫। আহারে সংযম সম্পূর্ণ ও সুদৃঢ় করণার্থ আর একটি উপায় বা অনুষ্ঠান আবশ্যক। ধনী হইতে নির্ধন পর্য্যন্ত যিনি

যে প্রকার আহার্য্য ব্যবহার করিতে ক্ষমবান্, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আহার্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে। যিনি প্রতিদিন পোলাও, কালিয়া, উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নাদি খাইতে সমর্থ, মাসের মধ্যে কয়েকদিন তাঁহারও সাদা ভাত এবং সামান্য ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি খাওয়া এবং সন্তানদিগকে খাওয়ান কর্ত্তব্য। যাঁহার আর্থিক অবস্থা এরূপ যে, প্রতিদিন সরু চালের অন্ন ও উত্তম ব্যঞ্জনাদি খাইতে এবং পরিবারবর্গকে খাওয়াইতে সমর্থ, তাঁহারও প্রতিমাসে কয়েক দিন করিয়া মোটা চালের ভাত এবং সামান্য সামান্য ব্যঞ্জনাদি খাওয়া এবং খাওয়ান ভাল। কাহারও কোন আহার্য্যে এরূপ অভ্যস্ত ও আসক্ত হওয়া উচিত নয় যে, তাহার অন্যথা করিবার শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহার সে শক্তি বিনষ্ট হয়, সে আহারে যথার্থ সংযমী হইতে পারে না; সুতরাং অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে, বড় কষ্ট পায়। এক ব্যক্তি ভাল অবস্থায় অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ও শয্যা-বিলাসী ছিল। সে প্রতিদিন দেড় সের দুই সের করিয়া মিছরির সরবৎ পান না করিয়া থাকিতে পারিত না এবং উত্তম শয্যায় উৎকৃষ্ট নেটের মশারি খাটান না লইলে তাহার ঘুম হইত না; কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতা কাহারও চিরদিন থাকে না; তাহার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িল। তখন এক ব্যক্তি দয়া করিয়া তাহাকে প্রতি মাসে ভিক্ষাস্বরূপ যে সাতটি কি আটটি টাকা দিতেন, তদ্ভিন্ন তাহার জীবন রক্ষার জন্য উপায় রহিল না। কিন্তু হতভাগ্য সরবতের লোভে সেই কয়টি

টাকার মধ্যেও প্রতি মাসে দুই তিনটি টাকা মিছরি কিনিয়া উড়াইয়া দিত। আহার্য্যে লোভ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইলে এবং আহারে দৃঢ়সংযমী হইতে হইলে, ধনী ও নির্ধন সকলেরই নিয়মিতরূপে আপন আপন অবস্থানুযায়িক উত্তম এবং অধম উভয়বিধ আহারেই অভ্যস্ত হওয়া এবং সন্তানদিগকে অভ্যস্ত করান কর্ত্তব্য। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিতে দেহের অনিষ্টকর খাদ্য, যাহার যেরূপ সাধ্য, তাহার দ্বারা যেন সেইরূপ বর্জ্জিত হয়।

(১)

খুল্লনার রন্ধন।

প্রভুর আদেশ ধরি, রান্ধয়ে খুল্লনা নারী,
সোঙারিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘৃত লবণ ঝাল, আদি নানা বস্তুজাল,
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
বাইগুণ, কুমড়া, কড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া,
বেসার পিঠালী ঘন কাঠি।
ঘৃতে সম্ভোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি,
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি, নৈটা শাকে ফুল বড়ি,
চিঙ্গড়ি কাঁটাল বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্তুক পাক,
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া।

দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড,
সন্তোলিল মহুরীর বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষুরস, কৈ ভাজে পণ দশ,
মরিচ গুঁড়িয়া আদা রসে॥
মসূরী মিশ্রিত মাস, সূপ রান্ধে রসবাস,
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল,
মান বড় মরিচে ভূষিত॥
বোদালি হেলঞ্চা শাক, কাটী দিয়া কৈল পাক,
ঘন বেস্থার সন্তোলন তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খড়া, চিঙ্গুড়ির তোলে বড়া
খরসোলা পূজী দশ তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন, আম্রে শকুল মীন,
খর লোণ দিয়া ঘন কাঠি।
রান্ধিল পাঁকালঝষ, দিয়া তেঁতুলের রস,
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাঁটি॥
কলা-বড়া মুগসাউলী, ক্ষীর-মোননা ক্ষীরপুলি,
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রাঁধে অবশেষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে॥

———

(২)

মজুমদার-পত্নীর রন্ধন।

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥
স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানা মত শাক।
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অড়হরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধ-থোর ডালনা শুক্তনি ঘণ্ট ভাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে গুঁড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ছোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
ময়া সোণাখড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙ্গড়ীর ঝাল ভাজা অমৃতের তার॥

কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক শুঁড়া॥
আম্র দিয়া শোল মাছে ঝোল চড়চড়ি।
আরি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ি ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা॥
অন্ত্র মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে রসলা পূরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমস্বত্ব আর আমসি আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মান্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিল পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষ পুরী পূলী।
চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥

কলা বড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজা-পূলী।
সুধারুচি মুচ-মুচি লুচি কত গুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভূরা রাজবরা চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিলা ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আশু বোরো আমন রান্ধিল্প ক্রমে ক্রমে॥
দলকচু ওড়কচু ঘি কলা পাতরা।
মেঘহাসা কালমানা রায় পানিতরা॥
কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুঁদি।
গুয়াশালী হরিলেবু গুয়াথুবি শুঁদী॥
খিশালী পেয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরে-ছড়ী চিনা ধলবার॥
দাম্মসাহি বাঁশ ফুল ছিলাট করুচি।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদরাজ লুচি॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলভোগ রান্ধে।
ধূলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালী ভূরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্কর চিনা চিনি সমতুল॥
মাকুমেটে মধিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনি-মন হরে॥

সুধা, দুধকমল খড়িকামুট্টি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে।
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাসমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দানার গুঁড়া রান্ধে।
যূথী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥
লতা মউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়।
মৃত হয় অমৃত্ অমৃত মৃত হয়॥

পঞ্চম অধ্যায়।

——:)*(:——

পরিধানে সংযম-শিক্ষা।

আহার্য্যের ন্যায় পরিধেয় সম্বন্ধেও আমরা অতিশয় অসংযত এবং বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় আহার অপেক্ষা বসনভূষণাদিতে আমাদের অধিকতর বিলাসিতা হইয়াছে। বিদেশীয় বণিক্‌দের জন্য এবং বিদেশীয়দিগের অনুকরণ ফলে, পরিধেয়াদির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে বটে। মোজা, কামিজ, সার্ট, গলাবন্ধ প্রভৃতি অনেক জিনিস পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ছিল না বলিলেই হয়, এক শত

বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় একেবারেই ছিল না। কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গ বস্ত্র-শিল্পের পীঠস্থানস্বরূপ। বঙ্গের ধুতি উড়ানী চাদর শাড়ী সাব্‌নাম আব্‌রোঁয়া অতুলনীয়। কিন্তু ঐ সকল অতুলনীয় সামগ্রী গ্রামে গ্রামে ব্যবহৃত হইত না, সম্পন্ন গৃহস্থেরাও সর্ব্বদা পরিধান করিতেন না। হুগলী জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রাম আমার জন্মস্থান—উহা বস্ত্র-শিল্পের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ—তথায় উৎকৃষ্ট ধুতি শাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। গ্রামে অনেক সম্পন্ন এবং দুই এক জন ধনাঢ্য লোকের বাসও ছিল, কিন্তু বাল্যকালে আমি তথাকার স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা কাহাকেও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতে দেখি নাই; সকলেই মোটা কাপড় পরিত; কেবল পূজা পার্ব্বণে দুই একখানা পট্টবস্ত্র, চেলি ও গরদ এবং কলিকাতা হইতে নীত দুই চারি খানা নিকৃষ্ট ঢাকাই ধুতি, চাদর এবং শাড়ী দেখিতে পাইতাম; এবং স্থানান্তরে গমনকালে, দুই চারি জন বয়োবৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত মিহি শাদা ধুতি এবং উড়ানী ব্যবহার করিতেন। তখন সম্পন্ন গৃহস্থদিগের উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রয় করিবার ক্ষমতা যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ প্রবৃত্তি ছিল না, তাঁহাদের এইরূপ ধারণা ও সংস্কার ছিল যে, জমিদার তালুকদারাদি ভিন্ন অপরের সৌখীন বসন-ভূষণাদিতে অধিকার নাই; 'মোটা চাল' রক্ষা করা যেমন কর্ত্তব্য, তেমনই সমীচীন। তখন মধ্যবিত্তগৃহের স্ত্রীলোকেরা আপন হাতে চর্কায় সূতা কাটিয়া, তন্তুবায়দ্বারা মোটা মোটা শাড়ী বুনাইয়া

লইয়া তাহাই পরিধান করিতেন এবং মিহি শাড়ী পরিধান করা নিন্দনীয় মনে করিতেন। তাঁহাদের নিকট জামার নাম পর্য্যন্ত কেহ করিত না—করিতে পারিত না। দারুণ শীতে বস্ত্রাঞ্চল ভিন্ন তাঁহাদের অন্য গাত্রবস্ত্র ছিল না, কেবল বৃদ্ধাদের নামাবলী ছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের স্বাস্থ্যের হানি হইত না। তাঁহারা যে রান্না, বাটনাবাটা, বাসনমাজা, গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কৃত করা, দিনরাত জল তোলা, কলাই ভাঙ্গা, চা'ল ঝাড়া, গরুর সেবা করা, কাপড় কাচা, ঢেঁকি ফেলা প্রভৃতি অসংখ্য শ্রমসাধ্য কাজ করিতেন—শীতে তাঁহারা কাতর হইবেন কেন? পুরুষদিগের শীতবস্ত্র ছিল, কিন্তু সে সেই তখনকার স্বদেশজাত লুই, কম্বল, খেষ, গড়া, বনাত। আমার গ্রামের এক ব্যক্তি—কিছু অল্পবয়স্ক—শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে এক যোড়া শাল চাহিয়া লইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাকে দিনকতক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। বালক-বালিকাদের গড়া,—বড় জোর, দোলাই ছিল। দুইটি ছোট ভাইয়ের মামার বাড়ী ছিল কলিকাতায়। কলিকাতায় তখন নূতন ধরণের জামাজোড়া আরম্ভ হইয়াছিল। ভাই দুইটি যে বার ছিটের ঘাঘারা পরিয়া বাড়ী গিয়াছিল, সে বার আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তখন আমাদের উৎকৃষ্ট শাল জামিয়ার ছিল—তেমন শাল জামিয়ার এখন আমরা চক্ষে দেখিতেই পাই না। কিন্তু তেমন শাল জামিয়ার যাহাদের সাজিত, কেবল তাহাদেরই সামগ্রী বলিয়া

তাহা স্বীকৃত এবং সম্মানিত হইত—তাহা দেখিয়া অপরের লালসা বা অন্তর্দ্দাহ কিছুই হইত না।

এই সমস্ত বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু সে দিনও চলিয়া গিয়াছে। এই পঞ্চাশ কি ষাট বৎসরের মধ্যে আমাদের বসন-ভূষণের অসম্ভব বাহুল্য, অসম্ভব বৈচিত্র্য, অসম্ভব বিস্তার, অসম্ভব সৌখীনতা হইয়া পড়িয়াছে—শুধু রাজধানীতে নয়, শুধু সহরতলীতে নয়, সমস্ত গ্রামে সমস্ত দেশে। রেশম, সাটিন, মকমল—এ সকল এখন কেবল ধনাঢ্যের ঘরে নহে, অতি অসম্পন্নের ঘরেও ঢুকিয়াছে; ঢুকিয়া বিলাসিতা এবং ঋণভার বৃদ্ধি করিতেছে। জামা ঘাঘরা প্রভৃতি কত রকমই যে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না; তাহাতে আবার নিত্য নূতন নূতন রঙ্গের খেলা, সাঁচ্চা ঝুটা জরির ত কথাই নাই। শুনিয়াছি, একটা কাটা কাপড়ের দোকানে এক ব্যক্তির নিকট একটা জরির জামার জন্য তিন শত টাকা চাহিয়াছিল। তদপেক্ষা বেশী মূল্যের জামাও হইয়া থাকিবে। তখনকার সেই সাদা চুড়িদার পিরাণ এখন একরকম পরিত্যক্ত। তৎপরিবর্ত্তে কত রকম-বেরকম জিনিস হইয়াছে, তাহার লেখা-জোখা যদি কেহ রাখিয়া থাকেন, তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন বলুন, আমি রাখিতে পারি নাই,—রাখা অতি ঘৃণিত কাজ মনে করি। আমরা পিরাণাদিতে যে রকম বোতাম দিতাম, এখন আর কেহ তাহা দেখিতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে রূপার বোতাম, সোনার বোতাম, পাথরের বোতাম, সোনার চেনে

গাঁথা বোতাম্, কতই দেখিতে পাই—ধনীর ঘরেও দেখিতে পাই, নির্ধনের ঘরেও দেখিতে পাই—যেন ধনী ও নির্ধনে প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। ধনী ত ধনী বটেই, নির্ধনও যেন ধনী হইয়া পড়িয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়, বড় ভয়ের কথা, বসনাদির এইরূপ বাহুল্য ও বিলাসিতা আমাদের অন্তঃপুরেও পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখনকার বাঙ্গালী রমণী আর সেকালের বাঙ্গালী রমণীর মতন নাই—স্বামি-সর্ব্বস্ব, সংসারসেবা-নিরত, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী বিলাসা-নভিজ্ঞা, আত্মসুখ-বিমুখী। তিনি বস্ত্রালঙ্কারের মোহে মুগ্ধ, অভিভূত; তাহাতেই তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকে, তাহার অভাবে তিনি স্বামীর কণ্টকরূপিণী, সংসারে অশান্তি-বিধায়িনী; তাহার জন্য তিনি স্বামীর অর্থের অপব্যয়কারিণী এবং আপন সংসারের কষ্টবর্দ্ধনকারিণী। শাস্ত্র নারীকে গৃহের লক্ষ্মী বলেন এবং মিতব্যয়ী বলিয়াই তাঁহারই হস্তে সংসারের ব্যয়ভার অর্পণ করিবার উপদেশ দেন। শাস্ত্র যে ঠিকই বলেন এবং ঠিক উপদেশই দেন, আমরা এতদিন তাহাই দেখিয়া আসিতেছিলাম। এখন কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। বিলাসিতার বিপুল বিক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া, সামান্য বাহ্যবস্তুর প্রলোভনে অভিভূত হইয়া এখনকার বাঙ্গালী রমণী যেন গৃহের অলক্ষ্মী হইয়া উঠিতেছেন এবং সংসারের অর্থসঙ্কট কোথাও সৃষ্টি করিতেছেন, কোথাও বাড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের অলঙ্কারের বাহুল্য ও বৈচিত্র্য অল্প দিনের মধ্যে

অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসরমাত্র পূর্ব্বে যে বাউটি পৈঁচা প্রভৃতির তত আদর ও গৌরব ছিল, অনেক দিন হইল, তাহা লোপ পাইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কত নূতন অলঙ্কার হইল এবং গেল, তাহার ঠিকানা নাই। এখন দেখিতেছি, আজ যে অলঙ্কার আদৃত, কাল তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে। বস্ত্রাদিতেও যেমন, অলঙ্কারেও তেমনই নিত্য নূতন 'ফ্যাসন' বাহির হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্টি কেবল বাহারের দিকে, সোনা রহিল কি মাটি হইল, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই,—ধনীর ঘরেও নাই, নির্ধনের ঘরেও নাই। এইজন্য সামান্য গৃহস্থের সামান্য অর্থ উড়িয়া যাইতেছে, অনেক স্থলে ঋণভার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। উহার উপর আবার বিদেশজাত স্বদেশজাত লাল গোলাপী সুগন্ধি সাবান, গায়ের রং ঢাকিবার এবং ভাল রং ফলাইবার পাউডার, দেহ-বস্ত্রাদি সুরক্ষিত করিবার অসংখ্য সুগন্ধি দ্রব্য, কেশ-বিন্যাস ও কেশ-বিন্যাসের অপরিমিত উপকরণ ও আসবাব আছে। রমণীর বিলাসিতা বিলাসান্ধতা, বিলাসোন্মত্ততা বঙ্গে কখন ছিল না। বঙ্গের এখন বড়ই দুর্দ্দিন। এমন দুর্দ্দিন আর কখনও হয় নাই—এ দুর্দ্দিনের সহিত তুলনায় কোন দুর্দ্দিনই দুর্দ্দিন বলিয়া গণ্য নয়। সমাজের মূলে গৃহ, গৃহের মূলে রমণী, সেই রমণী আজ মতিভ্রষ্টা। সংযমরূপিণী বঙ্গরমণী এখন বিলাসোন্মাদিনী—সংসার-রক্ষাকারিণী বঙ্গরমণী এখন সংসার-ধ্বংসকারিণী। আমরা বড় দরিদ্র—দরিদ্রের ঘরের মেয়ে এমন হইলে, আমাদের

ঘর থাকিবে না। বাঙ্গালীর ছেলেও এখন বাঙ্গালীর মেয়ের মতন—বাহ্যবস্তুর মোহে মুগ্ধ, বাহ্যবস্তুর আধিপত্যে অভিভূত, বাহ্যবস্তু লইয়া উন্মত্ত। নব্যা বঙ্গরমণীর ন্যায় তাহাদের সুগন্ধি-সম্ভার ত আছেই, তাহা ছাড়া তাহাদের আর দুইটি জিনিস আছে। তাহাদের অনেককে এক রকম মোজা পরিতে দেখি—পাতলা চিক্কণ রেশমের মোজা, তাহাতে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত একটা কি দুইটা ডোরা তোলা আর সেই মোজার উপযুক্ত একরকম জুতা পায়ে দিতে দেখি—বড় সৌখীন জুতা, উৎকৃষ্ট বার্ণিস চামড়া বা মকমলে বা অপর কোমল পদার্থে নির্ম্মিত। উহার তলা পাতলা, গোড়ালি একটু হেলান; অগ্রভাগ নাই বলিলেই হয়, আঙ্গুলগুলি মাত্র তাহাতে ঢাকা থাকে; অগ্রভাগে পা'ট-করা চওড়া ফিতার গুচ্ছ। কি মোজা, কি জুতা, কোনটিই পুরুষের উপযুক্ত নয়, যদি কাহারও উপযুক্ত হয়, কোমলাঙ্গী কামিনীরই উপযুক্ত। তৃতীয় আধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, আমাদের শরীর এবং মন দুইই মেয়েলী ভাবের হইতেছে। এখানেও তাহাই দেখা গেল। আমাদের পুরুষেরা মেয়ে হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের কেশ-বিন্যাসেও তাহা দেখি। কেশ লইয়া তাহারা ব্যতিব্যস্ত—কত কষ্টই করে।

বাহ্যবস্তুর মোহ আমাদের আহারে যত প্রকাশিত, বসন-ভূষণাদিতে তদপেক্ষা অধিক প্রকাশিত। আমাদের মন বাহ্য-বস্তুতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। বাহ্যবস্তু আমাদিগকে যাহা শুনাই-

তেছে, আমরা তাহাই শুনিতেছি—যাহা করাইতেছে তাহাই করিতেছি। আমরা আর আমাদের নিজের অধিপতি নই, বাহ্যবস্তুই আমাদের একমাত্র অধিপতি। আমরা ধর্ম্ম ভুলিতেছি, কর্ম্ম ভুলিতেছি; করিতেছি কেবল বাহ্যবস্তুর সেবা, বাহ্যবস্তুর দাসত্ব। ভোগে আমরা বিহ্বল হইতেছি, ভোগের জন্য দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইতেছি। প্রকৃত হিতাহিত-বিচারে আমরা অসমর্থ হইতেছি, আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে, বাহ্যবস্তুর তীব্র শাসনে আমরা ক্রোধ-পরায়ণ, ঈর্ষ্যা-পরায়ণ, পরশ্রী-কাতর, দ্বন্দ্ব-প্রিয়, দাম্ভিক, অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠিতেছি। তাই আমরা আমাদের নিজের বা সমাজের প্রকৃত হিতার্থ সকলে সম্মিলিত ভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছি না।

অতএব আমাদিগকে বাহ্যবস্তুর মোহ কাটাইতে হইবে; বাহ্যবস্তু হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, আমাদের অন্তর্ভাগে স্থাপিত করিতে হইবে। কাজ বড় কঠিন, কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য বুঝিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, তাহা করিতে হইবে। আহারেও যেমন, পরিধানাদিতেও তেমনি সংযমী হইতে হইবে—ধনাঢ্য, সম্পন্ন অসম্পন্ন সকলকেই হইতে হইবে—অসম্পন্নকে অপর সকলের অপেক্ষা অধিক সংযম হইতে হইবে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আহারে সংযমী হইবার জন্য যে পাঁচটি উপায় বা অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ করিয়াছি, পরিধানে সংযমী হইবার জন্যও তাহা অবলম্বনীয়। অর্থাৎ—

(১) আমাদের সন্তান-সন্ততির যাহাতে পরিধানাদিতে সংযত হইবার প্রবৃত্তি হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে উহাতে সংযত হইতে হইবে। আমাদিগকে খোষপোষাকী দেখিয়াও আমাদের সন্তান-সন্ততি ওরূপ হইবে না এরূপ প্রত্যাশা করা বাতুলতা। অতএব আমাদের নিজেদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরিধানাদিতে সংযম অভ্যাস করিতে থাকা গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

(২) আহার্য্যের ন্যায় পরিধানাদিতেও সন্তান-সন্ততিকে শৈশবকাল হইতেই নির্লোভ করিতে হইবে। নির্লোভ করিবার একটি সহজ উপায়—যে সকল বসনভূষণাদির চাকচিক্যে শিশু স্বভাবতঃই অধিক আকৃষ্ট হয়, সে সমস্ত তাহাকে না দেওয়া,—অন্ততঃ কম দেওয়া। পিতা মাতা সন্তানের প্রকৃত মঙ্গল বুঝিয়া, একটু শক্ত হইলেই এরূপ করিতে পারিবেন।

(৩) চতুর্থ অধ্যায়ের লিখিত তৃতীয় অনুষ্ঠান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাহ্যবস্তুর মোহ কাটাইবার পক্ষে, বাহ্যবস্তু হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, অন্তর্ভাগে লইয়া যাওয়ার ন্যায় উৎকৃষ্ট উপায় আর হইতে পারে না। ভগবানের সেবায় মনোহারিত্ব একবার অনুভব করিলে, বাহ্যবস্তুর মোহ ও মনোহারিত্ব আপনিই চলিয়া যায়। তখন কি আহার্য্য, কি পরিধেয়, কিছুতেই আর অন্যায় অযথা আসক্তি থাকে না। ভগবানের সেবায় আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হইয়া, সন্তানদিগকে শৈশব হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। আপনারা ঈশ্বরপরায়ণ

হইলে, এরূপ করিতে কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, প্রবল প্রবৃত্তি এবং পরম পরিতৃপ্তি হইবে। বাড়ীতে যখন পূজা প্রভৃতি হইবে, তখন শিশু বালক বালিকা যুবক যুবতীদিগকে তথায় উপস্থিত রাখিতে হইবে। যাহারা মন্ত্র বুঝিতে পারিবে, তাহাদের ত কথাই নাই, তাহারা মোহিত হইবে। শিশু এবং বালকবালিকা মন্ত্রার্থ বুঝিবে না বটে, কিন্তু মন্ত্রের শব্দে ও সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইবে। সকলেই জানেন, অজ্ঞান শিশু কোন কোন শব্দ শুনিলে ভীত, কোন কোন শব্দ শুনিলে বিরক্ত, কোন কোন শব্দ শুনিলে যেন মুগ্ধ, কোন কোন শব্দ শুনিলে উৎফুল্ল হয়। মানব-শরীরের সহিত শব্দের একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে। শব্দের অর্থ থাক্ আর নাই থাক্, শব্দের অর্থ বুঝা যাক্ আর নাই যাক্, শব্দ আপন ধর্ম্ম পালন করিবেই করিবে—মানুষে এক রকম না এক রকম ভাবের উদ্রেক করিবেই করিবে। সেই ভাব বারংবার উদ্রিক্ত হইলে, তাহাই স্বাভাবিক ও প্রীতিকর ভাব হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তাহার বিরোধী ভাবে বিরাগ জন্মিবে। আমাদের পূজাদির মন্ত্রের শব্দ বড় গম্ভীর, অপূর্ব্ব সঙ্গীত-বৎ—শুনিলে মোহিত হইতে হয়, রোমাঞ্চিত হইতে হয়, পৃথিবী মনে থাকে না। মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝি, শুধু উহার শব্দ শুনিতে শুনিতে যেরূপ হইয়া পড়িতে হয়, তাহাতে পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীর উপরের জিনিস লইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি আপনা আপনিই জন্মিয়া পড়ে। তখন বাহ্যবস্তু

অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় এবং বাহ্যবস্তু মোহ বিস্তার করিয়া মানুষের নিকট কুকথা কহিয়া তাহাকে কুপথগামী করিতে পারে না। আমাদের নৈমিত্তিক পূজাদি ত আছেই, তাহা ছাড়া প্রায় সকল গৃহে প্রতিদিন গৃহদেবতার পূজা হয়। তাহাতেও আমাদের শিশু বালকবালিকা যুবকযুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধবৃদ্ধা সকলকেই উপস্থিত থাকিতে হইবে। তবেই শৈশব ও বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিবার প্রবণতা জন্মিবে। শৈশব ও বাল্যকাল হইতে ঐ পথের অভিমুখী না হইলে, পরে উহাতে প্রবেশ করা বড় কঠিন হয়। যাহাদের ঘরে নিত্য এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়ার এত বাহুল্য ও ব্যবস্থা, সহজে ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিবার সুবিধা তাহাদের যত অধিক বোধ হয়, অপর কাহারও তত অধিক নয়। এমন সুবিধা যেন ছাড়া না হয়; ছাড়িলে আমাদের একদিকে মহাপাতক, অন্যদিকে দুর্দ্দশার একশেষ হইবে।

শৈশব হইতে মন্ত্র শ্রবণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর জ্ঞানোদয় হইতে সুকথা শুনিবার ও শুনাইবার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে। প্রতিগৃহে প্রতিদিন খানিকক্ষণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলের একত্র হইয়া পুণ্যকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। পুরাণ পুণ্যকথায় .পরিপূর্ণ, রামায়ণ মহাভারত ভাব-মাহাত্ম্যে অতুলনীয়। ঐ সকল গ্রন্থ নিত্যকর্ম্মের ন্যায় নিত্য পঠিত হইবে, আর ঐ সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠাংশ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া, বালক যুবক

স্ত্রী পুরুষ সকলের হস্তে প্রদত্ত হইবে, এবং সকলের দ্বারা পঠিত হয় কিনা, সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষিত হইবে। আমাদের গৃহকর্ত্তাদিগের বড় গুরুতর কাজ করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে হইবে, আলস্য বা ঔদাসীন্যের অবসর মাত্র থাকিবে না, পূর্ণ প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন।

(৪) পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, আহার্য্যের সহিত মান অপমানের কোন সম্পর্ক নাই। পরিধেয়াদি সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা বলা যায় না। গৃহের বাহির হইতে হইলেই পরিচ্ছদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ঘরে ছিন্ন বা মলিন বস্ত্র চলে, ঘরের বাহিরে চলে না। ছিন্ন বা মলিনবস্ত্রে গৃহের বাহিরে গেলে, লোকে ইতর অভদ্র বা অশ্রদ্ধেয় মনে করে। আবার ঐরূপ পরিচ্ছদে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট গমন করিলে, তিনি অপমানিত বা অবজ্ঞাত মনে করেন। অতএব পরিচ্ছদ ভাল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সকলেরই সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে এবং সন্তানদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে হইবে যে, ভাল পরিচ্ছদ বলিতে সৌখীন পরিচ্ছদ বুঝায় না—মোটা পরিচ্ছদ যদি শুভ্র বা পরিচ্ছন্ন হয়, তবে তদপেক্ষা ভাল পরিচ্ছদ আর হইতে পারে না। ঐরূপ পরিচ্ছদে আপনার এবং অপরের সম্ভ্রম যেরূপ রক্ষিত হয়, অন্য পরিচ্ছদে সেরূপ হয় না। অনেকে এখন মনে করেন যে, সৌখীন পরিচ্ছদই সম্ভ্রমসূচক। কিন্তু তাহা নহে। যে সৌখীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেড়ায় সে সারবান্ ও

সম্ভ্রান্ত লোকের ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইয়া থাকে। অতএব আপনারা পরিষ্কৃত মোটা পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়া, সন্তানদিগকেও ঐরূপ পরিচ্ছদ পরাইয়া পরাইয়া তাহারই পক্ষপাতী করিতে হইবে। কেবল বালকবালিকাদিগকে পূজা-পার্ব্বণাদিতে একটু চাকচিক্য-বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিলেই হইবে। কিন্তু উৎসবান্তেই তাহা খুলিয়া রাখিতে হইবে।

সামান্য গৃহস্থের এইরূপ করা ভিন্ন শ্রেয়ঃ ত আর নাই-ই; অধিকন্তু মনুষ্যত্বের বৃদ্ধিকরণার্থ ধনাঢ্যেরও এইরূপ করা কর্ত্তব্য। করিলে তাঁহাদের গৌরব ভিন্ন অগৌরব হইবে না। সাংসারিক হিসাবেও তাঁহাদের এইরূপ করা একান্ত আবশ্যক। ধন চিরস্থায়ী নয়, ধনীকেও নির্ধন হইতে হয়। অতএব আহার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাধ্যায়ে যেমন বলিয়াছি যে, উত্তম অধম দুই প্রকার আহারেই সকলের অভ্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য; পরিধেয় সম্বন্ধে এস্থলে তেমনই বলিতেছি যে, ধনীরও উত্তম অধম দুই প্রকার পরিধেয়ে অভ্যস্ত থাকা বিধেয়। অবস্থা বিপর্য্যয়ের জন্য সকলের সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা ভাল।

আহার্য্য অপেক্ষা পরিধেয়ের প্রলোভন বেশী। কারণ অপরের পরিধেয় দেখে বলিয়া ঐ সূত্রে অহঙ্কার ও আত্মাভিমান প্রকাশের বেশী সুবিধা হয়। পরিধেয়ের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলে, মনের দুর্ব্বলতা গিয়া শক্তিমত্তা এত বাড়িবে যে, সকল বিষয়ে সংযমী হওয়া সহজ, সুসাধ্য, সুখকর হওয়াই সম্ভব।

(৫) বসনভূষণের বাহুল্য ও বিলাসিতা কমাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, বিলাসোপযোগী বসনভূষণাদির ব্যবহার ও বিক্রয় বন্ধ করা। বিদেশী বণিকেরা এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ করিবে না, বন্ধ করিতে বলিলেও সে কথা শুনিবে না। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালী কাটা কাপড়ের দোকান খুলিয়া এবং সুগন্ধি তৈল বিক্রয় করিয়া, বিলাসিতা বাড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহাদিগকে বোধ হয় আপন মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসায় করিতে বলিলে অন্যায় করা হইবে না। বিদেশী বণিক্ আমাদিগকে বিলাসী করিতেছেন বলিয়া, আমরাই তাঁহাদিগকে কত তিরস্কার, কত নিন্দা করি। কিন্তু যে কাজের জন্য বিদেশী বণিক্ আমাদের দ্বারাই নিন্দিত ও তিরস্কৃত, অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য আমরা আপনারাই সেই কাজ করিতেছি। ইহা মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা—ঘোর ভয়াবহ কথাও বটে। আপনি আপনার শত্রু হইলে আত্মরক্ষা, আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নতি অসম্ভব। বিলাস বিক্রয় করিয়া বিদেশীয়েরা যে টাকা লইয়া যায়, তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ দেশে রাখিবার জন্য আমাদেরও বিলাস বিক্রয় করা অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়, এই কথা বলিয়া আমাদের বিলাস বিক্রয়ের পোষকতা করা যায় না। বিলাতী বণিকেরা লভ্যাংশ কমাইবার জন্য আপনারা আপনাদের সর্ব্বনাশের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া, কি ধর্ম্মনীতি কি অর্থনীতি, কোন নীতিরই অনুমোদিত নহে। বিদেশী বণিকের কার্য্যাকার্য্যে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার কোন উপায় নাই। সে

আমাদের যে অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহা করিবেই। কিন্তু আমরা আপনারা কি বলিয়া আপনাদের অনিষ্ট করি? মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য আমাদের আহার-পরিধানাদিতেও যেমন সংযত হওয়া আবশ্যক, অর্থোপার্জ্জন ব্যবসায়াদিতেও তেমনই সংযত হওয়া আবশ্যক। বিলাস বিক্রয় করিয়া, বিদেশী বণিক আমাদের অর্থ যাহাতে লইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য আমাদের আপনাদের বিলাস পরিহার করাই উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ উপায়। সেই কথাই এই পুস্তকে তছি, এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমরা সমস্ত স্বদেশীয়কে সে কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিতেছি। অর্থের জন্য ভাবিতে হইবে না। অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ, সদুপায়ে অর্জ্জিত হইবেই হইবে। ইহা অর্থনীতি শাস্ত্রেরই কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আমোদে সংযম-শিক্ষা।

পৃথিবী মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। জীবন-রক্ষার্থ মানুষের যাহা আবশ্যক, কর্ম্ম ব্যতীত তাহা পাওয়া যায় না। ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, বাসার্থ গৃহ, পরিধানার্থ বস্ত্র, রোগে ঔষধ—এসমস্ত কর্ম্মদ্বারা

লাভ করিতে হয়। মানুষের অন্যরূপ প্রয়োজনও অনেক। জ্ঞানোপার্জ্জন, বিদ্যোপার্জ্জন, অর্থোপার্জ্জন, স্বার্থসাধন, পদার্থ-সাধন, ধর্ম্মসাধন—এইরূপ অনেক প্রয়োজন আছে। এ সমস্তই কর্ম্ম—কর্ম্ম ভিন্ন ইহার কোনটি সিদ্ধ হয় না। চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে ইহার কোনটিই সম্পন্ন হয় না। শুদ্ধ তাহাই নহে। কর্ম্ম প্রাণপণে করিতে হয়—প্রাণপণে না করিলে, কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। কর্ম্মে একাগ্রতা, অধ্যবসায়, শারীরিক মানসিক উভয়-বিধ-শ্রম আবশ্যক। এত শ্রম আবশ্যক যে, মানুষকে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। তখন শরীর এবং মনে নূতন বল সঞ্চারিত করিতে না পারিলে, দুই-ই ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে হয়—হয় ত মৃত্যুও ঘটে। আহারে শরীরের ক্ষয়ের পূরণ হয়—শরীরের শ্রান্তি দূর হয়। শরীরের শ্রান্তি দূর হইলে, মনের শ্রান্তিও উপশম হয়। কিন্তু মনের অবসাদ দূর করিবার শ্রেষ্ঠতর উপায় আছে। সেই উপায় আমোদ। সমস্ত দিন কর্ম্মস্থানে কঠিন পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া, গৃহে আসিয়া, স্নেহ ভক্তি ভাল-বাসার পাত্রগুলিকে লইয়া, দুই দণ্ড বসিলেই মনের অবসাদ দূর হইয়া যায়, মন আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠে—সঙ্গে সঙ্গে শরীরও সুস্থ ও সবল হয়। কার্ডিনাল রিচিলিউ ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুইসের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—কর্ম্মের অবতার বলিলেই হয়—কত কাজ করিতেন, কত ভাবিতেন, কত চিন্তা করিতেন, তাহার সীমা ছিল না। অত বড় রাজমন্ত্রী কমই

দেখা গিয়াছে। কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে একটি ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে ঘোড়া হইতেন; তাঁহার ছেলেরা তাঁহার পিঠে বসিত, তিনি তাহাদিগকে লইয়া সমস্ত ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দিক্‌পালতুল্য পুরুষ ছেলের মতন হইয়া, ছেলের সঙ্গে ছেলেখেলা করিতেন—ছেলেখেলা না করিলে চলিত না বলিয়া ছেলেখেলা করিতেন। মানুষ অমর, অক্ষয়, অব্যয় নয়। শক্তির প্রয়োগে মানুষের শক্তি নাশ হয়, বলবিনিয়োগে মানুষের বলক্ষয় হয়, সুতরাং শ্রমে মানুষের শ্রান্তি হয়। অতএব শ্রমের পর বিশ্রাম আবশ্যক, অপরিহার্য্য। বিশ্রাম বলিতে কেবল চুপ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকা বুঝায় না। যে কার্য্য করিয়া শ্রান্তি হয়, তাহা ছাড়িয়া লঘুতর বা ভিন্ন প্রকৃতির কার্য্য করিলেও বিশ্রাম করা হয়। কার্ডিনাল রিচিলিউ কঠিন রাজকার্য্যে ক্লান্ত হইয়া, ছেলেদের সঙ্গে ঘোড়া ঘোড়া খেলিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেন। বোধ হয়, ইংরাজের ন্যায় শ্রম আর কেহ করে না। শুনিতে পাই, ইংরাজের ন্যায় খেলাও কেহ খেলে না। দেখিতেও পাই, আপিস আদালতাদিতে অসুখের ন্যায় খাটিয়া, অনেক ইংরাজ ক্রীড়াভূমিতে ক্রীড়া করিয়া তবে গৃহে গমন করেন।

যেখানে শ্রম, সেই খানেই বিশ্রামের প্রয়োজন—যেখানে কর্ম্ম, সেই খানেই আমোদ আবশ্যক। আমোদ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী নাই। আমোদ কর্ম্মেরই অংশ—কর্ম্মেরই অন্তর্ভূত, কর্ম্মেরই অন্তর্গত। যাহাদের কর্ম্ম নাই, তাহাদের

আমোদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং আমোদে অধিকারও নাই। আমোদে তাহাদের অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্যোচিত কর্ম্ম না করিয়া, মনুষ্যোচিত কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইয়া, বসিয়া বসিয়া কেবল আমোদ আহ্লাদ করা সর্ব্বপ্রকার অধোগতি, সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার অমোঘ, অব্যর্থ উপায়। আমাদের এখন যে কর্ম্ম নাই, আমরা যে কর্ম্মী নহি, আমরা এখন যে কর্ম্ম করিতে অসমর্থ, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আমরা ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে পারি না, কলকারখানা চালাইতে পারি না, পূর্ব্বপুরুষের জমিদারী পাইয়া তাহা উড়াইয়া দিই, একটা তিন হাত রেলের রাস্তা করিয়া চালাইবার দোষে সর্ব্বত্র নিন্দিত হই; পারি কেবল পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইস্কুল কালেজ করিতে। কিন্তু দেখিতেছি আমাদের আমোদ বাড়িতেছে, আমোদ আহ্লাদের বিপুল অনুষ্ঠান হইতেছে।

বালক ও যুবকদিগের মধ্যে ইয়ারকি বলিয়া একটা জিনিষ হইয়াছে। বাল্যকালে পল্লীগ্রামে এ জিনিষ দেখি নাই। এখন, কি সহর, কি পল্লীগ্রাম সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এ জিনিষটা ভাল নয়। পাঁচ জন সমবয়স্ক পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া এক জায়গায় একত্র হইয়া, পান তামাক চা চুরুট খায়, বাজনা বাজায়, গান করে, হাসির রোল তুলে, গল্প করে, লম্বা লম্বা কথা কয়, আত্মগরিমায় আস্ফালন করে, ছোট বড় সকলেই সমালোচনা করে, সকলের প্রতিই তাচ্ছিল্য প্রকাশ

করে—এইরূপ ইয়ারের দল এখন অনেক হইয়াছে, এইরূপ করিতে এখনও অনেকের আমোদ। এইরূপ বালক বা যুবকদিগের সম্মানার্হ কিছুই নাই। বিবাহ প্রভৃতির সভায় বয়োজ্যেষ্ঠদিগের নিকট ইহারা সুশীল বা সম্ভ্রমশীল হয় না; শান্ত শিষ্টের ন্যায় বসিয়া থাকিতে পারে না; অস্থির উদ্ধত ভাবে এক দিকে গিয়া হাস্য-পরিহাস এবং পান-তামাকে উন্মত্ত হয়, বয়োবৃদ্ধেরাই কুণ্ঠিত হইয়া এক পাশে বসিয়া থাকেন। আমোদপ্রিয়তা ইহাদের এতই অস্থি-মজ্জাগত যে, প্রকাশ্য সভাতে বয়োজ্যেষ্ঠদিগের নিকটেও ইহারা দুই দণ্ডের নিমিত্ত সংযত হইয়া থাকিতে পারে না; আমোদের জন্য এই যে একটা চঞ্চলতা চপলতা অস্থিরতা ধৃষ্টতার ভাব দাঁড়াইয়াছে, ইহার বিনাশ-সাধন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে বাহ্যবস্তুর প্রিয়তা বা বাহ্যবস্তুর মোহ, আহারে এবং পরিধানাদিতে আমাদের এত অসংযমের কারণ হইয়াছে, তাহাই আমাদের এই আমোদপ্রিয়তার এবং আমাদের অসংযমের কারণ।

আমাদের আমোদপ্রিয়তা এত প্রবল হইয়াছে, আমোদ আমাদের এত সার বস্তুস্বরূপ হইয়াছে যে, আমরা যে পুস্তকাদি পাঠ করি, তাহাও কেবল আমাদের জন্য। এখন সহর এবং মফঃস্বল সর্ব্বত্রই লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। গ্রামের বালক এবং যুবকেরা পুস্তক পড়িবার জন্য লালায়িত, কিন্তু পুস্তক পড়িতে পায় না, এই হেতুবাদে গ্রন্থকারদিগের নিকট পুস্তক চাহিয়া লইয়া লাইব্রেরী

স্থাপন করা হয়। এই হেতুবাদে বঙ্গে অনেক গ্রামে এখন লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল পাঠাগারে সকল প্রকার গ্রন্থই থাকে, কিন্তু পঠিত হয় প্রধানতঃ উপন্যাস ও নাটক। সংপ্রতি এক ধর্ম্মসভা-সংক্রান্ত পাঠাগারে সম্পাদক আমার পুস্তকগুলি চাহিয়াছিলেন। পাঠাইয়া দিবার সময় লিখিয়াছিলাম, আরও দুই চারি খানি পুস্তক পাঠাইব। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—চেষ্টা করিয়া খান কতক নাটক নভেল পাঠাইবেন। শুনিয়াছি, কলিকাতার, একটা খ্যাতনামা লাইব্রেরীতেও নাটক নভেলই বেশী পঠিত হয়।

এইরূপ এখন হইবার কথা;—আমরা অন্তঃসারশূন্য হইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় আমোদপ্রিয় হইয়াছি। এইরূপ লাইব্রেরী বা পাঠাগার আর স্থাপিত না হওয়াই উচিত—যেগুলি স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলিও উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ এইরূপ পাঠাগারে স্থাপয়িতা বা অধ্যক্ষগণ যেন তথায় নাটক নভেল না রাখেন এবং পাঠকেরা যাহাতে সদ্‌গ্রন্থ পাঠে মনোযোগী হন, সেই চেষ্টা করেন; যে বাহ্যবস্তুর মোহে আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এই সকল পাঠাগারের জন্য তাহাই বাড়িয়া যাইতেছে। পল্লীস্থ যুবক কর্ম্মী নয়; সুতরাং আমোদে তাহার অধিকার হয় নাই। তাহার জন্য এত আমোদের অনুষ্ঠান কেন? এ অনুষ্ঠান এক প্রকার পাপাচার। পাপাচার হইতে বিরত হওয়া সর্ব্বাগ্রে উচিত।

গৃহের বাহিরেও যেমন, গৃহের ভিতরেও তেমনই আমোদের

জন্য নাটক নভেলই অধিক পঠিত হয়; তবে গৃহের বাহিরে কেবল বালকে ও যুবকে ঐরূপ অনিষ্টকর গ্রন্থ পাঠ করে, গৃহের ভিতরে বালিকা এবং যুবতীরাও পাঠ করে। বাঙ্গালীর মেয়ে পূর্ব্বে এমন আমোদপ্রিয় ছিল না; সুতরাং সংসারে পুরুষের ষোল আনা সহায় ছিল না—সংসারধর্ম্ম নারীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া বুঝিত। কুশিক্ষায় বাঙ্গালীর মেয়ে এখন কুপথগামিনী—সংসারধর্ম্মে নষ্টমতি,—আমোদ আহ্লাদে বাঙ্গালী পুরুষের প্রতিযোগিনী। তাই গৃহের ভিতর বালক এবং যুবকের ন্যায় বালিকা এবং যুবতীও গান গায় ও বাজনা বাজায়। এখন অনেক বাড়ীতে প্রতিদিন হারমোনিয়ম বাজিতে শুনা যায়—সন্ধ্যার পর ত বাজেই, কোন কোন গৃহে সমস্ত দিনই বাজে। এ কেবল কর্ম্মহীন-কর্ম্মহীনা কুশিক্ষিত-কুশিক্ষিতাদিগের বাজনা—আমোদের জন্য বাজনা। এ বাজনায় কেবল অনিষ্ট হয়—বাহ্যবস্তুর মোহ এবং আধিপত্য বাড়িয়া যায়, ইন্দ্রিয়-সুখ সার সুখ হইয়া উঠে, অন্তর্বস্তু বিলুপ্ত হইয়া যায়। সঙ্গীত চৌষট্টি কলা বিদ্যার অন্তর্গত বটে, সঙ্গীতের উপকারিতা অনেক, সঙ্গীত মানুষকে মহত্ত্বের উচ্চতম স্তরে তুলিয়া দিতে পারে। যাঁহারা জগৎ দেখিতে জানেন, তাঁহারা বলেন জগৎ সঙ্গীতময়—rhythm—ময়। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গাহিতে গাহিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া বলিয়া দেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একটি অপূর্ব্ব অখণ্ড সঙ্গীত। কিন্তু সমস্ত বাহ্যজগৎ মানুষকে যেমন সুকথা এবং কুকথা দুই কথাই কহিতে পারে,

সঙ্গীতও তেমনই সুকথা এবং কুকথা দুই কথাই কহিতে পারে। সাধারণতঃ ইহা কুকথাই কয়। রক্তমাংসময় ইন্দ্রিয়ের সহিতই ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইংলণ্ডের মহাকবি বলেন—Song charms the Sense Eloquence the Soul। অনেকে বলিতে পারেন, Purition বলিয়া মিল্টন বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীতের নিকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয়, কতকটা তাহাই। কিন্তু কবির কথা যে বহুল পরিমাণে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সঙ্গীতে সুধা আছে বটে, কিন্তু সুধা অপেক্ষা বিষয়ই বেশী আছে। সেখানে অন্তঃ-সারের অভাব বা অল্পতা, সঙ্গীত সেখানে বিষময়—অপ্রবল ইন্দ্রিয়কে প্রবল করে, প্রবল ইন্দ্রিয়কে প্রবলতর করে। আমরা অন্তঃসার-শূন্য—কর্ম্মহীন, আমাদের রক্তমাংসময় ইন্দ্রিয় সকল বিদ্রোহী হইতেছে, বড় ভয়ের কথা! শুধু আমাদের নয়, আমাদের স্ত্রীলোকদিগেরও ইন্দ্রিয়সকল বিদ্রোহী হইয়া উঠি-তেছে। এখন প্রতিগৃহকর্ত্তার এই বিদ্রোহদমনে বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কু-পাঠ্য ও কু-সঙ্গীত যাহাতে গৃহে বিশেষতঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না পারে, সকল গৃহকর্ত্তার প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। নহিলে যথার্থই তাঁহাদের মহাপাতক হইবে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তজ্জন্য আমরা আপনারাই প্রধানতঃ দায়ী। আমরা আপনারা অবনত হইয়াছি বলিয়া, তাহাদিগকেও অবনত করিতেছি। আমার এক স্বর্গীয় সম্ভ্রান্ত

খ্যাতনামা বন্ধু একদিন আমার নিকট এই গল্পটি করিয়াছিলেন —"একবার-একটা রঙ্গালয়ে গিয়াছিলাম। কতকগুলি ভদ্র-ঘরের স্ত্রীলোকও গিয়াছিলেন। কতকটা অভিনয় হইয়াছে, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আর একটিকে বলিলেন, এখনও অভিনয় শেষ হয় নাই, ইহারই মধ্যে তুমি যাইতেছ কেন? সে স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, আমি আর থাকিতে পারিব না, আমি বাড়ী গিয়া হারমোনিয়াম না বাজাইলে, বাবুর ঘুম হইবে না"। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, বাবুই পত্নীকে কুপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্নীর পতিপরায়ণতা তখনও একেবারে যায় নাই। কি জিনিষ আমরা কি করিয়া ফেলিতেছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তে উদাসীন থাকিলে আর চলিবে না। আমরা যে আপনাদেরই দোষে আপনাদের ঘর নষ্ট করিতেছি, এই কথাটি একবার স্থির হইয়া ভাবিলে আত্মগ্লানি অবশ্যই উপস্থিত হইবে। আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, আত্মদোষ ক্ষালনের প্রবৃত্তি জন্মিবে। তখন আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা সহজ হইবে। অর্থাৎ মন বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের দিকে ফিরিবে, বাহ্যবস্তু অন্তর্বস্তুর নিকট অধম ও অনিষ্টকর প্রতীয়মান হইবে, ইন্দ্রিয় সকল আপনা আপনিই সংযত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। আমোদে আপনারা সংযত হইতে পারিলে, সন্তানদিগকেও সংযত করিতে পারিব। সংযমসাধনার্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে প্রকার উপায় ও অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ করিয়াছি, আমোদপ্রিয়তা সংযত ও নিয়মিত করণার্থ সেই প্রকার অনুষ্ঠানাদিও অবলম্বনীয়।

থিয়েটার বা নাট্যশালার অভ্যুদয়ে আমাদের আমোদ-প্রিয়তায় অস্তিত্ব সূচিত ; উহার প্রাদুর্ভাবে ইহার আধিক্য ও ব্যাপকতা জ্ঞাপিত। নাট্যশালার অভ্যুদয় অধিক দিন হয় নাই। পাইকপাড়ার রাজাদের বা মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের নাট্যশালার কথা বলিতেছি না—তাহাও পঞ্চাশ বৎসরেরও কম হইবে। আমি ব্যবসায়ী নাট্যশালার কথা বলিতেছি। উহার বয়ঃক্রম আরও কম—বোধ হয়, চল্লিশ বৎসরও নয়। ইহারই মধ্যে কিন্তু পাঁচ সাতটা নাট্যশালা হইয়াছে, আর পাঁচ সাতটাই চলিতেছে। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কতই যে তথায় যায়, তাহার সংখ্যা হয় না—যায় কেবল আমোদের জন্য, অনেকে মজিবার জন্য। যাহারা স্বল্পমতি অল্পবয়স্ক, তাহাদের এই সকল রঙ্গালয়ের প্রবল প্রলোভন সহ্য করিয়া থাকা অসম্ভব বলিলেই হয় ; তাহারা যথার্থই অধঃপাতে যাইতেছে। রঙ্গালয়ে সুশিক্ষা হইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু আমাদের রঙ্গালয়ে সুশিক্ষা হইতেছে না ; বোধ হয়, কুশিক্ষাই অধিক হইতেছে। সেখানকার নাচ গান, সাজ সজ্জা, হাবভাব, দৃশ্যপট সকলই ইন্দ্রিয়ের মোহকর,—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। সে মোহকারিতা, সে উত্তেজকতার কাছে বুদ্ধ চৈতন্যের দুই একটা কথা বা ধর্ম্মাধর্ম্মের দুই একটা উপদেশ কিছু করিতে পারে না। আমরা অন্তঃসারশূন্য, কর্ম্মহীন,অসংযতেন্দ্রিয়, বাহ্যবস্তুর মোহে মুগ্ধ—আমরাই রঙ্গালয়ে মজিবার উপযুক্ত পাত্র। তাই আমরাও মজিতেছি, আমাদের গৃহের যাঁহারা লক্ষ্মী, তাঁহা-

দিগকেও মজাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মোহান্ধতার, আমাদের সংযম উচ্ছৃঙ্খলতার কি আর সীমা আছে ?

এই সকল রঙ্গালয় আমাদের স্থাপিত, বিদেশীয়ের স্থাপিত নয়। স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে সুবোধ সূক্ষ্মদর্শী স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক লোকও আছেন। স্বজাতির শোচনীয় ও ভীতিজনক অবস্থা দেখিয়া, কেমন করিয়া তাঁহারা ঐ অবস্থার ভীষণতা এবং শোচনীয়তা বৃদ্ধি করেন, বুঝিতে পারি না। কেবল মনে হয়, অপর সকলের ন্যায় তাঁহারাও মোহাচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁহারা যখন অপরের চৈতন্য-সম্পাদনের প্রয়াসী, তখন তাঁহাদের নিজের চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিলে, বোধ হয়, তাঁহারা রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাই আমাদের রঙ্গালয়ে অধ্যক্ষগণের নিকট বিনীত নিবেদন, ঐ সকল স্থানে যখন সুশিক্ষা হইতেছে না, এবং কর্ম্মী নহি বলিয়া যখন আমাদের জন্য আমোদের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক, অসঙ্গত এবং অন্যায়, তখন এ গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। বন্ধ করিলে আর্থিক ক্ষতি হইবে বটে, কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে যেমন বলিয়াছি যে, বিলাস-বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম বন্ধ হইলে, অন্য উপায়ে অর্থ আসিবে, এস্থানেও তেমনই বলি যে, আমোদ-বিক্রয় দ্বারা অর্থাগম বন্ধ হইলে, অন্য উপায়ে অর্থ আসিবে। বিদেশীয় ব্যবসায়ী হইলে, তাঁহাদিগকে এ কথা বলিতাম না, বলিতে পারিতাম না। তাঁহারা আমাদের স্বদেশীয় ব্যবসায়ী, ঘরের লোক, পরম আত্মীয়, তাই তাঁহাদিগকে এ কথা বলি-

তেছি। বিদেশীয় ব্যবসায়ী এ দেশীয়ের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করে না; করিবেই বা কেন? কিন্তু স্বদেশীয় ব্যবসায়ী স্বদেশীয়ের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যবসায় করিলেই যেন ভাল হয়। তাঁহাদিগকে ঐরূপে ব্যবসায় করিতে অনুরোধ করিলে, বোধ হয় অন্যায় বা অসঙ্গত কার্য্য করা হয় না।

যদি রঙ্গালয় বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে, আশা করি যে, উহার অপকারিতা কমাইতে অনিচ্ছা বা আপত্তি হইবে না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার এক উপায়, রঙ্গালয়ের সংখ্যা হ্রাস করা। আর এক উপায়, অভিনয়ে স্ত্রীলোক নিযুক্ত না করা। তৃতীয় উপায়, স্ত্রীলোক এবং ২০ বৎসরের অনধিক-বয়স্ককে অভিনয় দেখিতে না দেওয়া। চতুর্থ উপায়, ঘন ঘন অভিনয় বন্ধ করিয়া, সপ্তাহে একদিন মাত্র অভিনয় করা। পঞ্চম উপায়, রাত্রি দশটার পর অভিনয় না চলে, এইরূপ নিয়ম করা। ইহাতে রাজার সাহায্য চাহি না, রাজার সাহায্য সম্পূর্ণ অননুমোদনীয়; রাজার সাহায্য পাওয়া যাইবেও না,—রঙ্গালয়াধ্যক্ষগণের স্বদেশপ্রেমিকতাই এ কার্য্যের জন্য যথেষ্ট। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবগুলির বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

আমোদে আমাদের অধিকার নাই। তথাপি আমাদের আমোদের জন্য এতগুলি রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সখের বা amature রঙ্গালয়ও অনেকে করিয়াছেন। কিন্তু

ইহাতেও আমরা সন্তুষ্ট নহি। সম্প্রতি একটা নূতন আমোদের অনুষ্ঠান কর়া হইয়াছে। আমরা অপনারাই সে অনুষ্ঠান করিয়াছি। সার্কাস (Sircus) করিয়া আমাদের আমোদপ্রিয়তা আরও বাড়াইয়া দিতেছি। এমন কাজ করিতে আছে কি ? রঙ্গালয়ের ন্যায় সার্কাসও তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের অমোদপ্রিয়তা এতই প্রবল হইয়াছে যে, আমরা ধর্ম্মচর্য্যাও আমোদে পরিণত করিতেছি। আমাদের অনেকের দুর্গোৎসবে সাত্বিক ভাব আর নাই, ভক্তিভাব আর দৃষ্ট হয় না ; ভক্তের একাগ্রতা উন্মত্ততা বিলুপ্ত, অন্নদান বস্ত্রদান নাই, আছে কেবল আমোদ আহ্লাদ নেশা নাচ থিয়েটার। ইহার অপেক্ষা অধোগতি আর হইতে পারে না। ধর্ম্মচর্য্যাকে ইন্দ্রিয়-চর্য্যা করিয়া তোলা বড় ভয়ানক কাজ। এমন কাজ যে করিতে পারে, তাহার বাহ্যজগৎই প্রদীপ্ত, অন্তর্জগৎ বিলুপ্ত। সে আপন কাজ এবং পরের কাজ করিবারই অনুপযুক্ত। তাই আমরা কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। আমাদের কাজে সকল উদ্যমই নিষ্ফল হইতেছে। বাহ্যবস্তুর মোহ কাটান বা কমান ভিন্ন ইহার প্রতীকার নাই। আমাদের কিরূপ অন্তঃসার-শূন্যতা ও অধঃপতন হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যে জ্ঞান এবং চৈতন্যের প্রয়োজন, তাহা বিলুপ্ত হয় নাই, বিলুপ্ত হইবেও না ; কেবল আমাদের ধর্ম্মভাবের প্রাণহীনতার উপর একটা প্রকাণ্ড মোহকর চাক-চিক্যময় বাহ্যজগৎ আসিয়া পড়ায় চাপা পড়িয়াছে। এই জন্যই

এই সকল কথা কহিতেছি। নহিলে কহিতাম না। অতএব আমাদের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, বাহ্যবস্তু বা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সংযমী হইতে হইবে—অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর দিকে ইন্দ্রিয়াদির যে স্বাভাবিক আবেগ আছে—একটা প্রকাণ্ড বাহ্যময়ত্ব আমাদের প্রাণশূন্য ধর্ম্মভাবের উপর নিপতিত হইয়া, যে আবেগকে এত বাড়াইয়া দিয়াছে—তাহা কমাইয়া ফেলিয়া, বাহ্যবস্তুকে আর কুকথা কহিতে দেওয়া হইবে না,—আর আধিপত্য করিতে দেওয়া হইবে না। যে প্রণালীতে যাহা যাহা করিলে এইরূপ করিতে পারিবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বাহ্যবস্তুর মোহ একবার নষ্ট করিতে পারিলে, বাহ্যবস্তুকে একটু সরাইয়া ফেলিতে পারিলে, আর বড় ভাবিতে হইবে না। দৃষ্টি আপনা আপনিই বাহ্যজগৎ হইতে ফিরিয়া অন্তর্জগতের উপর পড়িবে। বাহ্যজগতের বাহ্যশক্তি যতই হউক, অন্তর্জগতের ন্যায় অনন্ত অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি উহার নাই। অন্তর্জগতে একবার দৃষ্টি পড়িলে ধর্ম্মে প্রাণ প্রবেশ করিবে, আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে, শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, একক বা সম্মিলিত ভাবে সকল সৎকর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা, উল্লাসাদিতে সংযম-শিক্ষা।

মানুষ সর্ব্বদাই এমন অবস্থায় পতিত হয়, এবং মানব-জীবনে সর্ব্বদাই এমন ঘটনা ঘটে, যাহাতে অনেকে অধীর, অস্থির, দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। ঐরূপ হইলে, মানুষের মন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, বুদ্ধির বিমলতা নষ্ট হয়, কর্ম্ম বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এইরূপ অবস্থা বা ঘটনাতে সংযম বা অভ্যাস করিবার এবং সংযমশক্তি সঞ্চয় করিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। সে সুযোগ কাহারও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়, উপেক্ষা করিলে মনুষ্যত্ব লাভে ব্যাঘাত ঘটে, উপেক্ষা না করিলে, মনুষ্যত্বরূপ পরম ফল লাভ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিব :—

(১) ছাত্রের সুযোগ।—পরীক্ষান্তে এইরূপ সুযোগ ছাত্রের নিকট বর্ষে বর্ষে উপস্থিত হয়। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য ছাত্রের যে ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা হয়, তাহাই এই সুযোগের হেতু। এই ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠা-বশতঃ ছাত্রেরা অধীর ও অস্থির হইয়া পড়ে। তাহাদের আহার নিদ্রা থাকে না।

তাহারা পরীক্ষকদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। পরীক্ষক দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিলে, তাহারা সেখানকার বন্ধুবান্ধবদিগকে পত্র লিখিয়া পরীক্ষার ফল জানিবার চেষ্টা করে। কিন্তু মনের এইরূপ অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে কষ্ট হয় সন্দেহ নাই, খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হয় বলিয়াই, এরূপ চেষ্টায় ছাত্রের মনের বল বর্দ্ধিত হওয়া সুনিশ্চিত। কষ্ট সহ্য করিতে না শিখিলে, কষ্ট অতিক্রম করিতে পারা যায় না; কষ্টে কাতর হইলে, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মনের মেরুদণ্ড' গঠিত হইতে পারে না। ছাত্রদিগের বুঝা উচিত যে, তাহারা আপনারাই পরীক্ষার স্থলে উহার ফল নির্ণীত করিয়া আইসে—যে যেরূপ লিখিয়া আইসে, তাহাতেই তাহার ফল নিহিত থাকে। তাহাদের লেখা দেখিয়াই পরীক্ষক ফল নির্দ্দেশ করেন—তাহাদিগকে চক্ষে দেখিয়া সেই ফল নির্দ্দেশের অন্যথা করেন না, অর্থাৎ নম্বর বাড়াইয়া দেন না; সুতরাং ফল জানিবার জন্য অধীর হইয়া, পরীক্ষকদিগের দ্বারে দ্বারে গমন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক— ছাত্রোচিত কার্য্যও নহে। অধীর হওয়া সম্পূর্ণস্বাভাবিক বটে। কিন্তু অধীরতায় যখন ফলের উৎকর্ষ ঘটাইতে পারা যায় না, তখন অধীর না হইবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টি স্থির হইয়া বুঝিলে অথবা শিক্ষক মহাশয় বুঝাইয়া দিলে, চেষ্টায় প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। ছাত্রদিগের সংযম শিখিবার এমন সুযোগ কমই ঘটে—কারণ পরীক্ষার ফল

জানিতে তাহাদের যত ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠা অধীরতা অস্থিরতা হয়, বোধ হয় আর কিছুতে তত হয় না। এমন সুযোগ যেন বৃথা না হয়। যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়, তাহারা শিশুও নয় অজ্ঞানও নয়; পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য অধীরতা ও অস্থিরতার নিষ্ফলতা এবং অনিষ্টকারিতা বুঝিতে তাহারা অক্ষম নয়। অতএব বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝিয়া, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহারা আপনারাই চেষ্টা করিয়া স্থির ধীর সংযত হইয়া থাকিবে, এই-রূপ প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। তথাপি এই গুরুতর বিষয়ে অধ্যাপক এবং শিক্ষক মহাশয়দিগের তাহাদিগকে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা মনে করিলে, নানা উপায়ে আপন আপন ছাত্রদিগকে সংযত করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, তাঁহারা এ বিষয়ে কেবল যে মনোযোগী নহেন তাহা নয়, ছাত্রদিগকে অল্লাধিক প্রশ্রয়ই দিয়া থাকেন। ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। তাঁহাদের উপর আমাদের ছেলে গড়িবার ভার—সমস্ত ভার নয় বটে, কিন্তু অনেকটা ভার। কিন্তু, বোধ হয়, তাঁহারা ছেলে না গড়িয়া, ছেলে ভাঙ্গিবার মতন কাজই করেন। ছেলেদের বুঝা উচিত এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, এমন ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠায় স্থির ধীর এবং সংযত হইয়া থাকিতে শিখিলে, তাহারা যে মানসিক শক্তি এবং চরিত্রের উচ্চতা ও দৃঢ়তা লাভ করিবে, তাহা প্রকৃত মনুষ্যত্বের উপকরণ,—মানুষের চিরস্থায়ী সম্পত্তি—কর্ম্মশীলতার

অপরিত্যাজ্য ভিত্তি এবং তাহার সহিত তুলনায় পরীক্ষায় সফলতা অকিঞ্চিৎকর, নিষ্ফলতা প্রকৃত নিষ্ফলতা নহে। ছাত্রকে এইরূপে সংযম শিখাইবার ভার তাহার পিতারও বটে। পরীক্ষায় ফল জানিবার জন্য পুত্রকে ছুটাছুটি করিতে না দিয়া, পিতার তাহাকে ধৈর্য্যাবলম্বনে অভ্যস্ত করা উচিত। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময় অনেক ছাত্র নানাকারণে গোলমাল করিয়া, অপর ছাত্রদিগের পঠনে ব্যাঘাত ঘটায়। এইরূপ কারণ উপস্থিত হইলেই, শিক্ষক মহাশয় যদি সুকথায় তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, তাহাদিগকে সংযত করিবার বা সংযম শিখাইবার অনেক সুবিধা হয়। ফলতঃ ছাত্রেরা যখনই বিদ্যালয়ে অধীর অস্থির অশান্ত হইয়া পড়ে, তখনই শিক্ষক মহাশয়ের তাহাদিগকে সংযম শিখাইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সকল সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া শিক্ষক মহাশয় যদি তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে, ছাত্র-দিগকে সংযমে অভ্যস্ত করা সহজ হইয়া পড়ে। আবার ছাত্র যখন শিশুবৎ,—আট দশ বৎসরের অনধিক, তখন হইতেই তাহাকে অল্পে অল্পে সংযত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপ্রতি গৃহের কাহারও লক্ষ্য থাকে না; সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এপ্রকার সুযোগ বিদ্যালয়ে তত উপস্থিত হয় না, গৃহেই হয়। শিশু একটি ঘরে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছে, এমন সময় রাস্তায় একটা গোল উঠিল অথবা বরযাত্রীর বাদ্যের শব্দ শুনা গেল। শিশু অমনি

বই ফেলিয়া দেখিতে ছুটিল। শিশুর ঔৎসুক্য এবং উল্লাস অতি স্বাভাবিক এবং দূষণীয়ও নয়। কিন্তু দূষণীয় হইয়া উঠিতে পারে—শিশুকে অতিরিক্ত মাত্রায় চঞ্চল ও পাঠে অনাবিষ্ট করিতে পারে—অতএব শিশুর ঔৎসুক্য বা উল্লাসের কারণ উপস্থিত হইলে, পাঁচ বার বা তাহাকে প্রশ্রয় দিতে হয়, পাঁচ বার বা সংযত করিয়া থাকিতে হয়। 'তুমি যদি রাস্তায় না যাও তাহা হইলে তোমাকে সেই বিড়ালের ছবিখানি দিব' এইরূপ কথায় তাহাকে সংযত করিয়া রাখা অসাধ্য বা অসম্ভব নয়। প্রতি গৃহে ছোট ছোট ছাত্রকে এই প্রকারে সংযমে অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য।

(২) গ্রন্থকারের সুযোগ।—ছাত্রের যেমন পরীক্ষান্তে সংযম শিক্ষা করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। গ্রন্থকারের তেমনই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর ঐরূপ সুযোগ উপস্থিত হয়। অনেক গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রশংসাবাদ শুনিবার জন্য এবং সংবাদ-পত্রাদিতে অনুকূল সমালোচনা দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। যাঁহাদিগকে তাঁহারা গ্রন্থ উপহার দেন এবং যাঁহাদের হাতে সংবাদপত্রাদি থাকে, তাঁহাদের নিকট তাঁহারা হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করেন, এবং অনুকূল মত ও সমালোচনা লাভ করিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ নানা চেষ্টা করিয়া থাকেন। গ্রন্থ-সম্বন্ধে কে কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য গ্রন্থকারের যে ঔৎসুক্য হয়, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঔৎসুক্যে অধীর বা অস্থির হওয়া মনুষ্যোচিত নহে। ঔৎসুক্যের কারণ

উপস্থিত হইলে, সংযম অভ্যাস করিবার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংযম অভ্যস্ত হইলে যে মানসিক শক্তি লাভ করা যায়, তাহার সহিত তুলনায় গ্রন্থের প্রশংসা শুনিবার বা পাঠ করিবার আনন্দ অতি অকিঞ্চিৎকর। গ্রন্থকার এই সুযোগের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, গ্রন্থের প্রশংসা শুনিবার বা লেখাইবার জন্য ব্যাকুল হইলে, অথবা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে তাঁহার কেবল যে সংযমরূপ পরম বস্তু লাভ হয় না তাহা নহে, তাঁহার মনের অসারতা বাড়িয়া যায়, তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলেও তাহা বিলুপ্ত হয়, তিনি সাহিত্যের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া পড়েন, উচ্চ সাহিত্যসেবীরা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হন। টাকা বা নামের জন্য স্কুলপাঠ্য নয় এমন গ্রন্থ লিখিলে, গ্রন্থকারের এইরূপ দুর্গতিই হয়, অথচ টাকা বা নাম কিছুই হয় না। টাকা বা নামের নিমিত্ত গ্রন্থ লিখিতে নিষেধ করিলে কেহ যে নিষেধ শুনিবেন, এমন বোধ হয় না। কিন্তু যে জন্যই গ্রন্থ লিখিত হউক এবং গ্রন্থ লিখিয়া টাকা বা নাম পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্, গ্রন্থকার যদি গ্রন্থের প্রশংসা শুনিবার জন্য লালায়িত হইয়া না বেড়াইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে সংযম-শক্তির উন্মেষে, গ্রন্থ-প্রণয়ন কার্য্য তাঁহার মহানিষ্টের হেতু না হইয়া, অর্থ বা যশঃ-সঞ্চয় অপেক্ষা সহস্রগুণে হিতকর হইবে। যাঁহারা গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত দেন, তাঁহাদেরও একটু কঠোর হইলে সুফল ফলিবে। তাঁহারা যেন গ্রন্থকারের অযথা ঔৎসুক্যে সর্ব্বদা

অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কাকুতি মিনতি, দৃঢ়তা-সহকারে বন্ধ করিয়া দেন। সাহিত্যে এবং সমাজে তাঁহাদের দায়িত্ব বড় গুরুতর। কঠোরভাবে কর্ত্তব্য-পালন না করিলে, তাঁহাদের দ্বারা গ্রন্থকারের প্রকৃত ইষ্ট সাধিত না হইয়া, ঘোর অনিষ্টই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য এবং সমাজ তাঁহাদের জন্য অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(৩) সর্ব্বসাধারণের সুযোগ—সমাজে থাকিয়া, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা, উল্লাসাদির এত কারণ ঘটিয়া থাকে যে, কাহারই সংযম অভ্যাস করিবার সুযোগের অভাব হয় না—প্রকৃত পক্ষে, সকলেরই সংযম অভ্যাস করিবার অসংখ্য সুযোগ উপস্থিত হয়। এরূপ ছোট বড় অনেক সুযোগ প্রায় প্রতিদিনই আসিয়া থাকে। কাল তোমার এক আত্মীয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিলে। সেজন্য আজ তুমি উৎকণ্ঠিত। একটি চাকরীর জন্য তোমরা চারিজনে আবেদন করিয়াছ। আবেদনের ফল কাহার অনুকূল হয়, জানিবার জন্য তোমরা সকলেই উৎসুক। পুত্র অসুস্থশরীরে পরীক্ষা দিতে গিয়াছে। আসিয়া কি বলে শুনিবার জন্য সমস্ত দিন তোমার উৎকণ্ঠা এবং ঔৎসুক্য। তোমার পিতামহ ঠাকুর গ্রামে থাকেন। তাঁহাকে একখানি নামাবলী পাঠাইয়া দিয়া, উহা তাঁহার মনোমত হইল কি না, জানিবার জন্য তুমি উৎসুক। নিত্য নিয়ত এইরূপ ঔৎসুক্যাদির কত কারণ উপস্থিত হয়, তাহার সংখ্যা হয় না ; তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজনও

নাই। এই অসংখ্য স্থলে সকল লোকেই সংযম অভ্যাস করিবার অসংখ্য সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়—মনের শক্তি স্ফুরিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যবস্তুর আধিপত্য কমিয়া যায় এবং বুদ্ধির স্থিরতা ও নির্ম্মলতা জন্মিবার জন্য কার্য্যকুশলতা পরিবর্দ্ধিত হয়। ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠাদিতে মন স্বভাবতঃই বিচলিত হয়, সুতরাং স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ও স্থিরবুদ্ধি থাকে না। তখনই কিন্তু স্থির ধীর ও অবিচলিত থাকিবার চেষ্টা করিয়া, সংযম অভ্যাস করিতে হয়। কেহ কেহ তাহা করিয়া থাকেন—সকলেরই তাহা করা উচিত। পত্র আসিবামাত্র তাহা খুলিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই প্রবল এবং ডাকযোগে পত্র আসিলে ঐ প্রবৃত্তি আরও প্রবল হইয়া থাকে। পত্রে কি আছে জানিবার ঔৎসুক্য-বশতঃ এইরূপ হয়। ঐ ঔৎসুক্য কিন্তু অনেক স্থলে দমিত করা যায়। আমার এক বন্ধু ডাকের পত্র পাইলে, উহার শিরোনামার হস্তাক্ষরাদি দেখিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে, পত্রে কোন বিপদের সংবাদ নাই বা না থাকা সম্ভব, তাহা হইলে, প্রাপ্তিমাত্র উহা পড়িবার ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য সত্বেও, তিনি পাঁচ সাত দশ মিনিট রাখিয়া দিয়া তবে উহা পড়েন, এবং সেই অবসরে স্থিরভাবে অভিনিবেশ-সহকারে অন্য কর্ম্ম করেন। এইরূপে তাঁহার যে সংযম শিক্ষা হয়, তাহার সুফল তিনি সকল বিষয়েই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থলে ইহার অপেক্ষা সহস্রগুণে আশ্চর্য্য সংযম-শক্তির একটি গল্প বলিব। গল্পটি আমার পূজ্যপাদ বন্ধু

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। গুরুদাস বাবু যখন বহরমপুরে ওকালতি করিতেন, তখন বরাহনগর-নিবাসী শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তথায় চাকরী করিতেন। দুইজনের মধ্যে বেশ প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। এক বার পূজার ছুটি ফুরাইলে, দুই জনেই বহরমপুরে গমন করেন। সেখানে গিয়া প্রেমচন্দ্র বাবু গুরুদাস বাবুকে বলেন যে, বাটীতে গিয়া একটি পুত্রের পীড়া দেখি, আসিবার সময় পীড়ার সাংঘাতিক ভাব দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহার বাটী হইতে দুই দিন পত্র আসিল না। তৃতীয় দিনে প্রাতে দুইজনে একত্র হইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন। পথের ধারে ডাকঘর; ফিরিয়া আসিবার সময়, গুরুদাস বাবু প্রেম বাবুকে বলিলেন—চলুন ডাকঘরে গিয়া দেখা যাক্, আপনার কোন পত্র আসিয়াছে কি না। একখানি পত্র আসিয়াছিল। প্রেম বাবুর বাটীর পত্র। প্রেম বাবু তাহা লইলেন, কিন্তু খুলিলেন না। গুরুদাস বাবু সংবাদ জানিবার জন্য মহাব্যস্ত হইয়াছিলেন, এমন অবস্থায় কে না ব্যস্ত হয়? বাসাভিমুখে যাইতে যাইতে তিনি প্রেম বাবুকে পত্রখানি খুলিয়া দেখিতে বলিলেন। প্রেম বাবু কিন্তু যেন কিছুই হয় নাই। তিনি স্থিরভাবে বলিলেন, এখন নয়। বাসায় গিয়া সকলকে আহারাদি করিতে বলিলেন। যতক্ষণ সকলের আহারাদি না হইল, ততক্ষণ পত্রখানি খুলিলেন না, যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে রহিলেন। আহারাদি শেষ হইলে পর, পত্র পড়িয়া দেখিলেন, পুত্রের পীড়ার উপশম হইয়াছে।

আশ্চর্য্য মানুষের আশ্চর্য্য সংযম! এমন ঔৎসুক্য, এত উৎকণ্ঠায় এত ধীরতা, এমন নির্ব্বিকারতা! প্রেম বাবু এখন পরলোকে। তিনি যথার্থই মহাপুরুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বে কেমন করিয়া উঠিতে হয় তাহা জানাইবার জন্য আমাদিগকে সংযমের উৎকৃষ্ট উহারণ দিয়া গিয়াছেন।

আমাদের ঘরে ঘরে উৎকণ্ঠার কারণ সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়। কারণ, রোগ সকল ঘরেই আছে। রোগ কঠিন হইলে গৃহের সকলেরই, বিশেষতঃ গৃহকর্ত্তার উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না; উৎকণ্ঠায় অনেকে অধীর, অস্থির হইয়া পড়েন এবং মনের আকুলতায় ও বুদ্ধির চঞ্চলতায় চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটাইয়া, বিপদ্ ঘনীভূত করেন, হয় ত রোগীকে হারাইয়া ফেলেন। উৎকণ্ঠার এইরূপ কারণ উপস্থিত হইলে, সকলেরই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, রোগীর সেবা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার দ্বারা তাহার প্রাণ রক্ষা করত সমস্ত গৃহস্থের বিপদের শান্তি করা উচিত। করিলে কেবল যে বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহা নহে; তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফলও লাভ হয়। উৎকণ্ঠায় অধীর অস্থির না হইয়া, সংযত থাকিতে পারিলে, মনুষ্যত্বরূপ মহামূল্য সম্পত্তি হস্তগত হইবে। বিপদ্ যদি কাটিয়া নাও যায়, বিধাতা যদি একান্তই হৃদয়ের বস্তু কাড়িয়া লন, তথাপি তাহার পরিবর্ত্তে তিনি যে বস্তু দিবেন, তাহাতে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আমরা যাহা অমঙ্গল মনে করি, বিধাতা তাহা হইতেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল লাভের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন।

বিধাতার বিধানে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। আমরা জড়ত্ব-প্রধান, স্থূলদর্শী বলিয়া অমঙ্গলের কথা কই।

ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠার ন্যায়, উল্লাসেও আমাদের সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক হইয়াছে। শাস্ত্রে সৌভাগ্যে উল্লসিত এবং দুর্ভাগ্যে অবসন্ন হইবার নিষেধ আছে। কিন্তু উহা ধর্ম্ম-মার্গে যাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের প্রতি উপদেশ। ধর্ম্মমার্গে যাঁহারা অনুন্নত, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই নিষেধ-বিধি খাটে বলিয়া বিবেচনা করি না। আমি কিন্তু তাঁহাদের জন্যই এই সমস্ত কথা লিখিতেছি। উল্লাসে তাঁহাদের অধিকার আছে। কিন্তু অধিকার আছে বলিয়া, অবাধ অধিকার আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। উল্লাস বল আর যাহাই বল, কাহারই এমন অধিকার কিছুতেই নাই, যাহার ফলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় বা মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের উল্লাসে এইরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে। দুইটি উদাহরণ দিব।—

(১) বিবাহে উল্লাস।—পুত্রের সুশিক্ষায় আমাদের তেমন দৃষ্টি নাই; পুত্রকে সদাচারসম্পন্ন, ধর্ম্মানুরাগী ও সৎপথাবলম্বী করিবার চেষ্টা আমাদের নাই; কিন্তু পুত্রের বিবাহে আমাদের উল্লাসের সীমা থাকে না—নাচ, গান, বাদ্য, নাট্যাভিনয়, আলোককাণ্ড, ভোজবাহুল্য প্রভৃতি আমরা কতই করি। ধনাঢ্য হইলেও করি, সম্পন্ন গৃহস্থ হইলেও করি, অসম্পন্ন গৃহস্থ হইলেও করি। বিবাহ যে সাত্ত্বিক ক্রিয়া এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংস্কার, ইহা সম্পূর্ণরূপে

বিস্মৃত হইয়া, সকলেই এইরূপ আনন্দোল্লাস করি এবং তদ্দারা বিবাহিত এবং বিবাহিতাদিগের মনে এ ধারণা প্রবল করিয়া দিই যে, বিবাহ কেবল আনন্দোপভোগের জন্য। 'বিবাহে এত উল্লাস, এত ধূমধাম, হিন্দুর অনুচিত,—হিন্দুর অযোগ্য। যে বালক বা যুবকের বিবাহ, সে গুণবান্ হইলেও আমরা ধূমধাম করি, গুণহীন বা দুর্ব্বৃত্ত হইলেও ধূমধাম করি। আবার, ধূমধাম করিবার সামর্থ্য থাকিলেও ধূমধাম ত করিয়াই থাকি, সামর্থ্য না থাকিলেও, কন্যাপক্ষের নিকট হইতে অর্থ লইয়া ধূমধাম করি। বিবাহে এত উল্লাস বা ধূমধাম ন্যায্য হইলেও গুণহীনের বিবাহে উহাতে কেবল মনের অসারতা বা মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভাব বুঝায় এবং কুটুম্বের অর্থে উল্লাস বা ধূমধামে, উহা ছাড়া ঘৃণার্হ নীচতাও বুঝায়। বিবাহের উল্লাসে আমাদের মনুষ্যত্ব-হীনতা সূচিত হইতেছে এবং মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। আমাদের বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত। এরূপ আনন্দোল্লাস আমাদের এখন শোভাও পায় না, শুভকরও নহে।

(২) রাজনীতি-ক্ষেত্রে উল্লাস।—আমরা এখন খুব রাজনৈতিক আন্দোলন করি। ইহাতে এক প্রকার অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে কেবল বক্তৃতাদানে অধ্যবসায়ের পরিচয়। রাজাকে দুইটা বক্তৃতা শুনাইয়া দেওয়া কঠিন কাজ ত নই, বড় বেশী মানসিক শক্তিমত্তার পরিচায়কও নয়। রাজার নিকট হইতে দুইটা নূতন অধিকার বাহির করিয়া লইতে পারিলে, অথবা রাজার বক্রদৃষ্টি হইতে

দুইটা পুরাতন অধিকার রক্ষা করিতে পারিলেই, প্রকৃত শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু সেরূপ পরিচয় পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি না। যাহা প্রকৃত কৃতীর প্রাপ্য, আমরা তাহা কেবল বক্তৃতাকারীদিগকে দিয়া ফেলিতেছি। যিনি বিলাতে দুইটা বক্তৃতা করিয়া এখানে আসেন, অথবা কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে বড় বড় বক্তৃতা করেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের এতই উল্লাস হয় যে, তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া, আমরা আপনারাই তাঁহার গাড়ী টানিয়া লইয়া যাই। এত অল্পে এত উল্লসিত হওয়ার অর্থ এই যে, আমাদের মনের প্রকৃত সারবত্তা হয় নাই এবং মনে মনুষ্যত্ব ও কৃতিত্বের আদর্শ অতিশয় ক্ষুদ্র রহিয়াছে। এত অল্পে এত উল্লসিত হইতে থাকিলে, মনের সারবত্তা বাড়িতে পারিবে না, এবং কৃতিত্ব ও মনুষ্যত্বের আদর্শ উচ্চতর হইবার ব্যাঘাত ঘটিবে। এরূপ উল্লাসে সংযত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। এরূপ উল্লাসের অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়—হৃদয়ঙ্গম করিলেই লোকের সংযত হইবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। যাহাদিগকে লইয়া আনন্দোল্লাস, তাঁহারা ইহাতে প্রশ্রয় না দিয়া সদুপদেশ দ্বারা লোককে সংযত করিবার চেষ্টা করিলে আরও সুফল ফলিবে।

সংযম অভ্যাস করিবার আরও অনেক উপায় আছে। শুনিতে সে গুলি বড় ক্ষুদ্র উপায়, কিন্তু কার্য্যতঃ বেশ ফলপ্রদ। দুইটির উল্লেখ করিব। চুলকনা প্রভৃতি সকলেরই হয়।

হইলে চুলকনার স্থান না চুলকাইয়া থাকিতে পারা কঠিন—এত কঠিন যে অনেকে লজ্জাসরম ভুলিয়া চুলকাইয়া থাকেন। কিন্তু কঠিন হইলেও, না চুলকাইয়া থাকাও অসাধ্য নয়। খানিকক্ষণ না চুলকাইলে কেবল যে চুলকনা থামিয়া যায়, তাহা নহে; অধীর হইবার কারণ সত্ত্বেও ধৈর্য্য রক্ষিত হয়, অর্থাৎ, সংযম অভ্যাস করা হয়। ছারপোকার কামড়ে অনেকেই অধীর অস্থির হইয়া থাকেন। কিন্তু উহাতে মানুষ মরে না—ইচ্ছা করিলেই উহা খানিকক্ষণ করিয়া সহিয়া থাকা যায়। সহিয়া থাকিতে থাকিতে, উহা আর অসহনীয় মনে হয় না এবং সংযমরূপ শক্তি সঞ্চিত হয়। শরীরকে যত সহাইতে পারা যায়, মনের শক্তি তত বর্দ্ধিত হয়। শেষে মনের শক্তির বহুল বৃদ্ধিতে, শারীরিক কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি এক রকম অলৌকিক হইয়া পড়ে। নিদ্রিত শস্ত্রগুরু পরশুরামের মাথা কোলে করিয়া মহাবীর কর্ণ কি ভীষণ কীট-দংশন-কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, সকলেই তাহা জানেন। সেইরূপ কষ্ট সহ্য করিবার কথা অলীক, অসম্ভব বা অসঙ্গত নয়। কয়েক বৎসর হইল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক ভারতবাসীর সম্বন্ধে প্রায় ঐরূপ কথাই লিখিত হইয়াছিল। এদেশ ঐরূপ কথারই দেশ। ভারত তপস্যা, তপশ্চরণ, কঠোরতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মহাদেশ। ভারতবাসীকে ঐরূপ কথার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। তাহাকে ঐরূপ কথা যে আবার শুনাইতে হইতেছে ইহাই দুঃখ।

অষ্টম অধ্যায়।
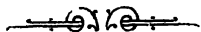
সভাসমিতিতে সংযম-শিক্ষা।

সভা-সমিতি এদেশে চিরকালই আছে। বিবাহের সভা, শ্রাদ্ধের সভা, একজাই সভা—বহু পূর্ব্ব হইতে আছে, কিন্তু এখন এক প্রকার সভা-সমিতি হইতেছে—যথা প্রবন্ধপাঠার্থ সভা, প্রতিবাদ করণার্থ সভা, অশ্রুপাত করিবার জন্য সভা ইত্যাদি—যাহা পূর্ব্বে ছিল না। এখন সভার বড়ই বাহুল্য; কথায় কথায় সভা, অলিতে গলিতে সভা, মাঠে ময়দানে সভা। ফলতঃ মোটামুটি বলিতে গেলে, আমরা এখন কেবল দুইটা কাজ পূরাদমে করিতেছি—গৃহের ভিতর বিবাহ, গৃহের বাহিরে সভা। এই সকল নূতন সভা-সমিতিতে আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরাই অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। তথায় যাইতে তাঁহাদের উৎসাহ, আগ্রহ এবং আনন্দও খুব বেশী। কিন্তু সকল প্রকার সভা-সমিতিতে তাঁহাদের যাওয়া অকর্ত্তব্য। যে সকল সভা-সমিতির উদ্দেশ্য শিক্ষা-দান বা জ্ঞান-প্রচার বা সাহিত্য-বিজ্ঞান-ধর্ম্মাদির আলোচনা নয়, প্রধানতঃ উত্তেজনা—যেমন রাজনৈতিক সভা বা সমিতি—যুবকদিগের তথায় যাওয়া উচিত নয়, তাহাদিগকে তথায় যাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য প্রকার সভা-সমিতিতে তাহাদের মধ্যে মধ্যে যাওয়া ভাল। সভা-সমিতির ন্যায় সংযম-শিক্ষা করিবার

প্রকাশ্য স্থান অল্পই আছে। তথায় শিষ্টাচার রক্ষা করিতে হয়, সংযত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, মনঃসংযোগ সহকারে বক্তৃতাদি করিতে হয়, ইত্যাদি। ইহাতে সংযম শিক্ষার সুবিধাই হয়। আবার সভা-সমিতিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার অনেক কারণ উপস্থিত হয়। অধিক জনতা হইলে অনেকে বসিবার স্থান পান না, অনেকে ঠেলাঠেলি করেন, অনেকে গ্রীষ্মাধিক্যে কষ্ট পান। কিন্তু এই সকল কষ্ট ও অসুবিধা স্থিরভাবে সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে, সংযম অভ্যাস হয়। কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত সংযম-শক্তি লব্ধ হইবার নয়। যে যুবক মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়াসী, মধ্যে মধ্যে তাহার সভা-সমিতিতে যাওয়া ভাল। এবং জনতার জন্য অশিষ্টাচার না হয়, গোলমাল না হয়, সভার কার্য্যের ব্যাঘাত না ঘটে, তদ্বিষয়ে সকল যুবকেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। তাহা হইলে বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের যে উপকার হইতে পারে, সংযম অভ্যাসের ফলে তদপেক্ষা অনেক অধিক উপকার হইবে। তাহারা যদি সংযত হইয়া থাকিবার চেষ্টা না করে, অথবা বিশৃঙ্খলা বাড়াইতে থাকে, তাহা হইলে, সভাপতি যেন মিষ্টভাবে কিন্তু দৃঢ়তা-সহকারে তাহাদিগকে দমিত করিয়া রাখেন। বার বার এইরূপ দমিত হইলে, তাহারা সংযমে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। এজন্য, বিশেষ বিবেচনা করিয়া সভাপতি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। সভাপতি অযোগ্য হইলে, সভার বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া যায়, যুবকেরা অধিকতর দুরন্ত ও দুর্বিনীত হইয়া পড়ে, সুতরাং সভায় গিয়া

তাহাদের উপকার না হইয়া অপকারই হয়। বিজ্ঞ বহুদর্শী মিষ্টভাষী সংযতমনা দৃঢ়চেতা ব্যক্তি দেখিয়া যেন সভাপতি করা হয়, তাহা হইলে, উদ্দাম অসংযত যুবকেরাও ক্রমে ক্রমে দমিত ও সংযত হইয়া উঠিবে।

জনতা ছাড়া সভা-সমিতিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার আর এক প্রকার কারণ আছে। বোধ হয়, জনতা অপেক্ষা সেই সকল কারণেই যুবকেরা বেশী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে। বক্তৃতা যদি তেজস্বিনী না হয়, অথবা অনুচ্চস্বরে প্রদত্ত হয়, অথবা যুবকদিগের মনোমত না হয়, তাহা হইলে তাহারা নানা-প্রকার অবজ্ঞা ও অপমানসূচক শব্দ করিয়া, অথবা গোলমাল করিয়া, অশিষ্টতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে। যখন এইরূপ ঘটে, তখন সভাপতি যুবকদিগকে সুকৌশলে দমিত করিয়া, তাহাদের অশেষ উপকার সাধন করিতে পারেন। কিন্তু কখন কখন সভাপতিকে ইহার বিপরীত কার্য্যই করিতে দেখি। অনেক দিন হইল, একবার এক সভায় গিয়াছিলাম। আমাদের এক প্রধান বাগ্মী সভাপতি হইয়াছিলেন এবং এক ব্যক্তি রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন; তার পর এক ব্যক্তি কিছু বলিলেন—যুবকেরা চুপ করিয়া শুনিল। তাঁহার পরে যিনি বলিতে লাগিলেন, তিনি বয়সে ও জ্ঞানে বেশ প্রবীণ, কিন্তু বাগ্মী নহেন—বড় ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন। তিনি পাঁচ সাত মিনিট বলিবার পরই যুবকেরা মহা গোল করিয়া উঠিল—হিস্ হিস্ শব্দ

আধিপত্য ও প্রভাব স্বভাবতঃই কত প্রবল, তাহা আর বার বার বলিবার প্রয়োজন নাই। এই জন্যই বাহ্যবস্তুর সহিত সংগ্রাম এত কঠিন সংগ্রাম। কঠিন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে বড় কঠিন, বড় কঠোর, বড় কষ্টকর প্রণালীতে সংগ্রাম করিতে হয়। আমাদের ঘরে ঘরে এই কঠিন, কঠোর, কষ্টকর জীবন-প্রণালী অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাপুরুষ ভূদেব লিখিতেছেন :—

"দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি। আমাদের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান, বাজনা, আমোদ, প্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবল প্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে : আমাদিগের মধ্যে গান, তামাসা, নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান্ তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে ; সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইকর্গস্ হইতে হইবে ; কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান্ করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না *।"

* পারিবারিক প্রবন্ধ, ৫ম সংস্করণ ১১৭ পৃষ্ঠা।

আমাদের এক্ষণকার কাজ কত কঠিন এবং কোথায় করিতে হইবে, মৃত মহাপুরুষের কথাতেও তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু একাজে, আমাদের মন নাই, বড় ঔদাসীন্য। এটা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ তাহাও আমরা যেন জানি না। তাই একাজের কথা উত্থাপন করিয়াছি। এবং ইহা কিরূপ, গুরুতর, কত কঠিন কাজ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ও করাইবার চেষ্টা করিতেছি। অগ্রে একাজ না করিয়া, অপর কার্য্যে মন দিয়া, আমরা বিষম ভ্রম করিতেছি।

বাহ্যবস্তুর অনুধাবনে আমরা নিয়ত নিরত, কারণ বাহ্যবস্তুর মোহে আমরা অভিভূত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অহঙ্কার, অভিমান, দম্ভ, ঈর্ষ্যা, ক্রোধাধিক্য প্রভৃতি যে সকল দোষ থাকিলে মানুষে মানুষে মিলিত হইতে পারে না, মানুষ হইতে মানুষ দূরে গিয়া পড়ে, মানুষের সহিত মানুষের আলিঙ্গন অসম্ভব হয়, প্রধানতঃ বাহ্যবস্তুর জন্যই তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমার ক্ষুদ্র বাড়ীর সম্মুখে তুমি বৃহৎ অট্টালিকা তুলিলে—হিংসায় আমার বুক ফাটিতে লাগিল, আমি তোমার শত্রু হইলাম। লোকে তোমার পুস্তকের প্রশংসা করিল, আমার পুস্তকের নিন্দা করিল, তুমি আমার দুই চক্ষের বিষ হইলে। আমি ঐশ্বর্য্যশালী, বড় বাড়ীতে থাকি, গাড়ী ঘোড়া চড়ি—তুমি দুঃখী, হীনবেশে আমার কাছে আসিলে, ঘৃণা করিয়া আমি তোমার সহিত কথা কহিলাম না। আমি কেমন করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব। দুইটি

কণ্টকাকীর্ণ যষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধা যায় না, বাঁধিলেও, বাঁধন শীঘ্র খসিয়া পড়ে। বাহ্যবস্তুর মোহ-জনিত এই সমস্ত দোষও মানুষের কণ্টকস্বরূপ। যাহাদের এইরূপ দোষ থাকে, তাহা-দিগকেও পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধা যায় না; বাঁধিলেও তাহাদের বাঁধন শীঘ্র খসিয়া পড়ে। বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধে সংযম-শিক্ষা হইলে, মানুষে এই সকল কণ্টক জন্মিতে পারে না; সুতরাং মানুষের সহিত মানুষের দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ হইবার ব্যাঘাতও ঘটে না। কি করিলে সংযম শিক্ষা করা যাইতে পারে, এই পরম ফল লাভ করিবার আশাতেই, এই গ্রন্থে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। বাহ্যবস্তুর মোহে কেবল যে আমরাই মুগ্ধ, তাহা নহে। ঐ মোহে ইউরোপীয়েরা আমাদের অপেক্ষাও মুহ্য। বাহ্যবস্তুর অনুধাবন তাহাদের মধ্যে যথার্থই অতি প্রচণ্ড। তথাপি বাহ্যবস্তুর জন্য তাহারা দশজনে মিলিয়া কার্য্য করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। এরূপ কেন হয়? আমার বোধ হয় যে, এরূপ হইবার দুইটি কারণ আছে। বাহ্যবস্তু, ঈর্ষ্যা, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু ঐ সকল কুভাব আমাদের দেশে ব্যক্তিবর্গকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিলিত হইতে দেয় না; কিন্তু ইউরোপে ব্যক্তি-বর্গকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া, কেবল এক জাতিকে অপর জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করে। তাহাতে জাতিবিদ্বেষ-রূপ যে কুভাব উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে কোন একটি জাতির

ব্যক্তিবর্গ পরস্পর হইতে দূরে না থাকিয়া পরস্পারের সহিত দৃঢ়ভাবে মিলিত হইতেই প্রণোদিত হয়। এই জন্যই ইউরোপে বাহ্যবস্তুর অনুধাবন এত প্রচণ্ড হইলেও, বাহ্যবস্তুর নিমিত্ত সমবেত চেষ্টা হইতেও পারে, এবং হইলে, সফলও হয়। ইউরোপে যেরূপ জাতীয় ভাব ও জাতি-বিদ্বেষ আছে, এ দেশে সেরূপ নাই। থাকিলে, বোধ হয়, আমাদের মধ্যেও সমবেত চেষ্টা সফল হইত। সম্প্রতি এখানে ঐরূপ জাতীয় ভাব ও জাতি-বিদ্বেষের কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইয়াছে এবং সেইজন্য এ দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের জন্য একটু একটু ইচ্ছা ও সমবেত চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ইউরোপের ন্যায় জাতীয় ভাব ও জাতি-বিদ্বেষ যেন ভারতে প্রবল না হয়। ভারতের বাহ্য সম্পদ্ ও উন্নতি কেবল মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন কালে তাহাই হইয়াছিল। এখনই বা না হইতে পারিবে কেন? ভারতের মন্ত্রশিষ্য জাপানবাসীর হইতেছে ত।

এরূপ প্রভেদ হইবার আর একটি কারণ এই যে, স্বার্থসাধন যে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত হইতে পারে না,—স্বার্থসাধনেও যে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ অপরিহার্য্য, আমরা তাহা বুঝি না, ইউরোপীয়েরা বুঝেন। তাই তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টা সফল হয়, আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা নিষ্ফল হয়। স্বার্থের মূলে পরার্থ আছে। পরার্থমূলক স্বার্থই প্রকৃত স্বার্থ, ধর্ম্মমূলক এবং ধর্ম্মানুমোদিত। ইউরোপীয়ের স্বার্থ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া স্বার্থসাধনে তাহার সিদ্ধি এত অধিক।

সংযমের অভ্যাসে বাহ্যবস্তুর মোহ কাটে, আধিপত্য ক্রমে। কিন্তু সংযম-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব গাঢ় ও সজীব হওয়া আবশ্যক। অভ্যাসের ফল অবস্থার গতিকে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম একবার প্রাণ অধিকার করিলে এবং ধর্ম্মভাব সজীব থাকিলে, উহাদের আর বিনাশ বা বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। সংযম অভ্যাসও যারপরনাই সহজ হইয়া পড়ে এবং সংযম-অভ্যাসের ফলও অবিনশ্বর হইয়া যায়। ধর্ম্মরূপ ভিত্তি না থাকিলে, সংযম সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারা যায় না। ধর্ম্ম প্রাণ অধিকার করিলে প্রাণ আর কিছুই চাহিতে পারে না। ভারত পূর্ব্বে আর কিছু চাহিতও না। মুসলমান রাজত্বে আর কিছু চায় নাই। ইংরাজের রাজত্বে কিন্তু বড় অধিক পরিমাণেই চাহিতেছে। দেখিয়া যেন সন্দেহ হয়, আমরা সেই ধর্ম্মপ্রাণ মায়াবাদীদিগের বংশোদ্ভূত কি না; ধর্ম্মাত্মতার দেশে বিদেশীয়ের পার্থিবতা আনিয়া ঢালিয়া দিল; ধর্ম্মাত্মদের বংশধরেরা অমনি পার্থিবতায় মজিয়া গেল—এ যে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা। তবে কি পার্থিবতা অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মতা নিকৃষ্ট পদার্থ? সহসা আশ্চর্য্য হইতে হয় বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য হইতে হইবে না। অনেক দিন হইতে আমাদের ধর্ম্ম প্রাণশূন্য, সুতরাং শক্তিশূন্য হইয়াছে। তাই যেমন পার্থিবতা আসিয়াছে, অমনি বিনা সংগ্রামে আমরা তাহার অধীনতা, তাহার দাসত্ব স্বীকার করিতেছি। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা পূর্ব্বে এদেশে বড় ছিল না। এখন কত প্রবল হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি।

এখনকার মতন অর্থলালসা যশোলিপ্সাদিও এদেশে ছিল না। অর্থোপার্জ্জন, সৎকীর্ত্তি-স্থাপন প্রভৃতি তখন কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে হইত। প্রকৃত ধর্ম্মভাব এখনও হয় নাই বলিয়াই, ধর্ম্ম এখনও প্রাণশূন্য বলিয়াই, ধর্ম্মান্দোলনাদি সত্ত্বেও, লিপ্সা, লালসা লোলুপতাদি এত প্রবল হইয়াছে, অথচ কর্ত্তব্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই। অতএব আমাদের ধর্ম্মে আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সংযম-শিক্ষায় আমাদের যেমন অন্যান্য অনেক উৎকৃষ্ট ফল ফলিবে, আমাদের ধর্ম্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠায়ও তেমনই প্রভূত সহায়তা হইবে। সংযম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কি বলা যাইতে পারে ? আর একটী কথা—পুণ্যশ্লোক প্রতাপের সেই চিরস্মরণীয় কথা :—

"On the banks of the Peshola, Pertap and his chiefs had constructed a few huts (the site of the future palace of Oodipur) to protect them during the inclemency of the rains in the day of their distress. Prince Umra, forgetting the lowliness of the dwelling, a projecting bamboo of the roof caught the folds of his turban and dragged it off as he retired. A hasty emotion, which disclosed a varied feeling, was observed with pain by Pertap, who thence adopted the opinion that his son would never withstand the hardships necessary to be endured in such a cause. 'These sheds', said the dying prince, 'will give way to sumptuous dwelling, thus generating the love of ease ; and luxury with its concomitant evils will ensue, to which the independence of Mewar, which we have

bled to maintain, will be sacrificed and you, my chiefs will follow the pernicious example. They pledged themselves, and become guarantees for the prince, 'by the throne of Bappa Rawal,' that they would not permit mansions to be raised till Mewar had recovered her independence. The soul of Pertap was satisfied, and with joy he expired."

প্রতাপের যেরূপ অধীনতা হইয়াছিল, আমাদের অধীনতা তদপেক্ষা সহস্রগুণে শোচনীয়। যেরূপ স্বাধীনতা পুনর্লাভ করিবার জন্য প্রতাপ এত কষ্টসহিষ্ণুতার আবশ্যক দেখিয়াছিলেন, আমাদিগকে যে স্বাধীনতা পুনর্লাভ করিতে হইবে, তাহা তদপেক্ষা সহস্র গুণে উচ্চ। প্রতাপের অধীনতা মোগলের অধীনতা, আমাদের অধীনতা পার্থিবতার অধীনতা। প্রতাপের প্রয়োজন—মিবারের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। আমাদের প্রয়োজন—আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। তথাপি প্রতাপ আপন সর্দ্দারদিগকে কষ্টসহিষ্ণুতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না করাইয়া, সুখে মরিতে পারেন নাই। সংযম-শিক্ষার জন্য এবং ধর্ম্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যতই কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন হউক, আমরা তাহাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব না? হইব বৈ কি।